হাতি-ধরিয়ে নায়ার

শক্তি চট্টোপাধ্যায়



হাতি-ধরিয়ে নায়ার

হাতি-ধরিয়ে নায়ার

৭৪

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
জানুয়ারী, ১৯৮৬

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
সন্ধ্যারাণী পান
আদ্যাশক্তি এন্টার প্রাইজ
৩২/২ সাহিত্য পরিষৎ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম ঃ ১০ টাকা

বুবু আর বাপ্পাকে

সূচী

মুড়ি

গোটের রুজুরুজু বিশাল আমলকি গাছ। তার পাশেই পোড়ো ইঁটের পাঁজা। বেশি পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। পাঁজার গর্তে গর্তে বেজির বাড়-বাড়ন্ত সংসার। পায়ের শব্দে যেতে-যেতে মুখ তুলে থমকে তাকায়; এক মুহূর্ত। তারপর যেদিকে যাবার একটু দৌড়ে যায়।

দেয়ালের গায়ে কতকালের শ্যাওলা, ফার্ণ। সরু পথ থেকে ডেঙো মেরে ভেতরের গাছগাছালি নজরে পড়ে। যুঁই ফুলের গাছ, পাহাড়ি চাঁপা, কাগজ ফুলের লতা—কতো কী? নাম না জানা হরেক গাছ আর এক-লাইন ঘাস ফুল। ভেতরে ঢুকতেই কাছারি বাড়ি, দুর্গাদালান। দালানে হাঁড়িকাঠ পোঁতা। সিঁদুরে ছয়লাপ। নিত্য পুজো টিমটিমে। ষষ্ঠীর দিন থেকে চারদিন জমজমাট। বলি হয়। জমিদার বাড়ির ফর্সা পাঞ্জাবি গায়ে ছেলেপুলেরা, বড়োরা কলকাতা থেকে আসে। কেউ কাঁসর বাজায়, কেউ পেটা ঘড়ি। কেউ দোলায় চামর, কেউ ধুনুচির ওপর পাখা দেয়। আশ্চর্য সুগন্ধে ভরে যায় দুর্গামণ্ডপ। অষ্ট-ধাতুর স্থায়ী মাতৃমূর্তি তখন ভীষণ উজ্জ্বল, আয়ত চোখ দুটি থেকে স্নেহ ঝ'রে পড়ে। প্রতিধ্বনি ছোট থেকে বড়ো হয়। গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গাদালান ভরে যায় গ্রামের ছেলেমেয়ের খুশিতে। বলি হয় আখ, চালকুমড়ো আর নিখুঁত কালো পাঁঠা। ভোগ যায় বাড়ি বাড়ি। পাঁঠার নিরামিষ ঝোল অর্থাৎ তাতে পেঁয়াজ পড়বে না, রসুন পড়বে না। রান্না হবে সরল তরল।

এই পুরনো জমিদারবাড়ি আরো একবার ঘুম থেকে জাগে, তখন

বাসন্তী পুজো। কিন্তু সে জাগায় বিস্ময় ছোটো। সে জাগার কথা আজ আর সুদর্শনের তেমন করে মনে নেই। সুদর্শনের কথা উঠলে, তার মনে পড়লো—সুদর্শন পোকার কথা। প্রায় মাদি ডেয়ো পিঁপড়ের মতন চেহারা। একটু মোটা, একটু বা শাদা ফোঁটায় ভর্তি পিঠ। প্রকৃতি অলস। ওড়ে না, হাঁটে। গাঁয়ের মেয়েরা জানে—ঐ পোকা দেখা মানেই—হয় স্বামী শহর বিদেশ থেকে ফিরবে, নয়তো আসবে মনি অরডারের টাকা। ফলে, এর নাম টাকা-পোকাও। মাঝখানে টাকা-পোকা রেখে আঙুল দিয়ে মাটির ওপর তিন তিনটে গণ্ডি কাটা আর প্রণাম করা। অন্তরে যে কথা আসছে, তাও মনে মনে শুনিয়ে দেওয়া চাই।

তারপর চলে পিওনের জন্যে প্রতীক্ষা। গাঁয়ে পিওন ঢুকলেই, বাচ্চাদের দৌড় করানো।

ছ্যাখ তো আমাদের কিছু এয়েচে কিনা ?

সুদর্শনরা খুব গরিব। শরিকানি বাড়ির এককোণে পড়ে থাকে। ওর বাবা শহরের এক মিষ্টি দোকানের কারিগর। মাসে দুমাসে শহর থেকে এলে, তাঁর সঙ্গে কিছু টাকা আসে, আসে বহু রকমারি মিষ্টি। কোনোটা একটু বেশি পুরনো, ভাঙাচোরা, কিছু খুবই টাটকা। যেটা যখন যেভাবে সরাতে পেরেছেন তিনি, সেইভাবে জমিয়েছেন। টিনের কৌটোয় থাকতো বলে, তাদের অনেকগুলোয় বেশ টিনের গন্ধবাস। সুদর্শন একা আর কতো খাবে ? পাড়ায় বিলোতো। পাড়াগাঁয়ে ওসব ধসা-পচা টিনের বাস কেউ গায়ে মাখতো না। গাল ভরে খেতো। অমিরতি, সিমলের কড়া পাক, বোঁদে আরো কতো কী। বোঁদের নানা রঙে সুদর্শন ভারি আহ্লাদ পায়। টুকে টুকে খায়। একটা দুটো করে দানা গালে পোরে আর চোখ বুজে দাঁতে কাটে। রস অবশ্য মরে চিনি ! তাতে কী ?

আর বাবা আনে টিনের ফুল-তোলা সুটকেশ। কাঁসা, পেতল, ভরনের থালাবাটি। বেদানা, আপেল, মনাক্কা, আলুবখরা। বাবা খুব

ভালো। বাবা সুদর্শনকে ভারি ভালোবাসে। এক ছেলে—দ্বিতীয় পক্ষে। প্রথম পক্ষে কেউ নেই। প্রথম পক্ষও অনেককাল গত। তারপরই সুদর্শনের মা এবং বছর দশেক পরে সুদর্শন। সংসারধর্ম, পাপপুন্য, ভালো-মন্দ—সবই তাকে কেন্দ্র করে। হবেই তো? এ আর বেশি কথা কী? মার সঙ্গে সুদর্শন একাই থাকে গাঁয়ের বাড়িতে। কমলালেবুর খোসা শুকুতে থাকে জানলায়, পানের সঙ্গে তাই তিনি টুকরো করে খান। বাবার অনেকগুলো পিকদানি আছে। ছোট বড়ো মাঝারি। ওঁর হাঁপানির টানের সময়, তাতে গয়ের ফেলেন। মা পিচ ফেলেন যেখানে-সেখানে। জালের জাল্না মাঝে-মধ্যে বুজে এসেছে। ক্রস-ওয়ার্ডের ছকের মতন। সুদর্শন ক্রস-ওয়ার্ড চেষ্টা করে, পারে না। ওর মাষ্টারমশাই অনেক লাইন মেলান। তাঁর থেকে এটা পেয়েছে সে। উনি বলেছেন, এতে ইংরিজি স্টক অব ওয়ার্ড বাড়বে। সুদর্শন ক্রমে-ধীরে বড়ো হচ্ছে। ইস্কুলে ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি হয়েছে গত বছর। একটু বেশি বয়েসেই ইস্কুলে গেলো সে। এতদিন অল্পসল্প পড়তো বাড়িতে। আর না দিলে নয়—কেমন বেটো হয়ে যাচ্ছিলো। এই মাঠঘাট বনবাদাড়ে রাত্রিদিন ঘুরছে। এই গুলি খেলছে, এই দাড়িয়াবান্ধা, এই কপাটি, তো ঐ ক্যাম্বিসের বলে লাথ। এভাবে কোনো গরিব ঘরের ছেলের চলে না। চলা উচিতও না। সেজন্যেই ইস্কুল। সেজন্যে ধরা-বাঁধা ছকে ওকে ফেলার চেষ্টা!

ভারি পেটরোগা সুদর্শন, সেই এক টুকরো বয়েস থেকেই। তাই থানকুনির ঝোল আর কাঁচকলা থোড় আর গাঁদালের লম্বা জল। কী বিচ্ছিরি গন্ধ এই গাঁদালের—রাঁধার সময় বাড়ি টেঁকা যায় না। খাবার সময় অবিশ্যি কোনো গন্ধবাস নেই। ঐ যা রক্ষে। নয়তো মরে যেতো সুদর্শন। ইতিমধ্যেই কালমেঘ, আনারসের কোঁক ছেঁচা খেতে-খেতে পেটে চড়া পড়ে গেছে। বাতাসার ওপর পেঁপের রস। গেঁড়ির ঝোল আর রক্তে সিঙ্গি। এসব খেতে-খেতে জিব এলে গেছে তার। আর কুমারেশ। যতো শিশি খেয়েছে, তা যদি



এককাট্টা করা যেতো, তাতে কুমারেশের একটা ছোটখাট টিলা-ঢিবি হয়ে যেতো।

ঠিক দুক্কুরবেলা তালগুঁড়ির ঘাটে বসে পুঁটলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার দিন কাবার। একতাল গোবর ছুঁড়ে চার। কেঁচো আর পিঁপড়ের ডিমের টোপ। কখনো কখনো কুচো চিংড়ির কাটা টোপ। দারুণ মাছ খেতো। পুঁটি, ট্যাংরা, কই-এর কথাই নেই। মাঝে মধ্যে উঠতো ন্যাদোস, বেলে, ল্যাটা। রুই-মিরগেলের বাচ্চাও নেহাৎ কম উঠতো না। মীন রাশ কিনা! তাই, মাছের সঙ্গে অদ্ভুত যোগাযোগ ছিলো সুদর্শনের। আর একটা কাজ করতো সে। কলসী মালসা ফুটো করে গলার কাছে বাস্না বেঁধে-জড়িয়ে, শামুক ছেঁচে তার ভেতরে দিয়ে, জলে বুড়িয়ে দেওয়া। সন্ধ্যে নাগাদ এই কম্ম করে, ভোর হতে-না-হতেই জল থেকে তুলে ফেলা। ভেতরটা খরখরিয়ে ওঠে। গা ছমছম করে তার। কিন্তু, ও জিনিস তো মা তাকে দেবে না। আর দিলেও হালকা ঝোল। ভালো লাগে? ওঁরা খাবেন ঝাল। রগরগে কষা। আর আমার বেলায় ঐ কুচ্ছিত জলের ঢেউ! ঘেন্না করে। আর ধরবে না, কচু। বয়ে গেছে। পরের পেট-পুজোর জন্যে সে খামোকা খেটে মরবে কেন? এক হিসেবে মা-ও তো পর। পেট তো আলাদা, না কি? তোমরাই বলো।

কচু পাতার কোষে ফটিক জল। রোদ্দুর পড়লে সলোমনের মণি। বিষ্টি হয়ে গেলে একধরনের ভাপ বেরোয় মাটি থেকে। বাঁশবনে ডাহুক আর হাঁড়িচাঁচা। সোঁদা গন্ধ নাকে এসে ঝামরে পড়ে। রঙিন চক্‌রাবক্‌রা শামুক একেবারে কলা গাছের ডেকলোয়। শুঁড় বের করছে। পাতার ওপর ওর হাঁটার দাগ—আটার মতন সুতোর ছাপ। জলে ধুয়ে যাচ্ছে। জলের টুপটাপ শব্দে ছাঁচতলা ভরে যাচ্ছে। কাগজের নৌকো তৈরি করে জলে ভাসাচ্ছে সুদর্শন। ছাঁচে জল পড়ে গর্ত-গর্ত। জলের রঙ হুঁকোর জলের মতন। পল পচে

পড়ছে তো ? উঠোনের কোণে একরাশ স্বর্গফুল ফুটেছে। মানে, ব্যাঙের ছাতা, অর্থাৎ ছত্রাক। ডুমো ডুমো নরম শাদা আর ছাই-রঙা বল্টু গাঁথা রয়েছে যেন। গাঁয়ের দিকে এর নাম কোঁড়ক। খেতে এক্কেবারে মাংসের মতন। ভাজা খেতে পারো, তরকারি করে খেতেও পারো। কিছু চিংড়িমাছে দিলে, কিছু মাংসের স্ট্যুপে। চমৎকার লাগে। তবে, মা বোধহয় দেবে না। পেটের দোষ বড্ড বেড়েছে এসব খেলে ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে পড়বে—ডাক্তার নাকি এ-ই বলেছে। ছাইয়ের ডাক্তার। খেতে না করেছে, না কচু। ওষুধ তো খাচ্ছি-ই, তাহলে আর অত্যাচার করতে অসুবিধে কী ?

কোনো কোনো জায়গায় হঠাৎ সুদর্শনের গা কেমন ছমছম করতে থাকে। একবার না, প্রতিবারই। ফি-বারই মনে হয়, এখানে যেন কিছু একটা আছে। কী আছে ? সঠিক জানা যায় না। তবে আছে। তারই ফলে—ঐ কিছু থাকার কথা। আসলে জায়গাটা নির্জন, ভাঙাচোরা, অন্ধকার। গুয়ের শ্বাসরোধী ভ্যাপ্‌সা গন্ধ থমকে আছে। শব্দ আছে—কীসের শব্দ বোঝা যাচ্ছে না। ঐ রকম জায়গায় পৌঁছুলে সুদর্শন প্রায় চোখ বন্ধ করে একছুটে অঞ্চলটা পার হয়ে যায়। গ্রামের মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি ভয়ংকর ভয় দেখানোর জায়গা আছে, যা সুদর্শন একা সামাল দিতে পারে না। তাছাড়া, সে ভয়হীন, ডানপিটে। রাতভিত নেই, শ্মশান-মশান নেই—কুছপরোয়া—নেই।

ঠিক ঐরকম—আমলকিতলা দিয়ে এগিয়ে গেলে, বাঁহাতি ইটের পাঁজা রেখে বরাবর জলে গেলে জমিদার-বাবুদের যে শানপুকুর—তার জল গোটা গ্রাম খায়। তার মাছ সুদর্শন একবার দেখেছিলো—সে মাছ, না মাছের ছায়া ! মুণ্ডুটা এ্যাত্তো বড়ো, গায়ে একফোঁটা গত্তি নেই, কাঁকাল-সার। অমন ভয়ংকর চেহারার মাছ সুদর্শন কখনো দ্যাখেনি। ওর নাম ভূতে-পাওয়া মাছ, শাঁকচুন্নি পেত্নীর নজর আছে ঐ পুকুরের মাছে। ও মাছ মানুষকে ভয় দেখায়।

সুদর্শন ওর মাকে বলেছিলো, মা, শানপুকুরের জল আর এনো না।

কেন রে? সব্বাই খায়! অমন জল!

বলছি এনো না, বাস। ও পুকুরে পেত্নীর দিষ্টি আছে।

কি যে সব ছাইপাঁশ বলিস? তোর মাথার ঠিক নেই নাকি?

তাহলে এনো, কিন্তু, আমি ও জল ছোঁব না। তারপর সুদর্শন ওর মাকে ব্যাপারটা খুলে বলে।

হতে পারে রে। ও বাড়িতে তো কম লোক মরেনি। অশান্তি নিয়ে যে অনেকেই মরেছে! তারা মানুষের কাছাকাছি থাকতে চায়। পারলে একটু ভয় দেখায়, একটু অনিষ্ট করে। তুই আর ওদিকে যাস না। কী দরকার!

তুলোবুড়ির বাড়ি সুদর্শনদের বাড়ির কাছে। প্রথমে বাগেদের বাড়ি। তারপর ধম্মঠাকুর। তারপর বিশ্বাস-বাড়ি—ভিটে সমস্তই ব্রহ্মডাঙা হয়ে আছে। অতঃপর তুলোবুড়ির বাড়ি। বুড়ি পৈতে তৈরি করে আর বেচে। তিনকূলে কেউ নেই। বয়েস? বয়েসের গাছপাথর নেই। সরু তারকাঁটার গায়ে মাটির কেমনধারা নাড় বানায়। সেই নাড়ু তারে গেঁথে তকলি। সেই তকলিতে শাদা কাপাস তুলো বাঁ হাতের দু আঙুলে আলতোভাবে ধরে ডানহাতের দু আঙুলে তকলি বনবন ঘোরায়। ভেজা তুলো থেকে সরু সুতো তকলিতে জড়াতে থাকে। সেখান থেকে পৈতে। এক পয়সায় একটা, খুব সরু দুটো তিন পয়সা।

বাবার জন্যে মা কিনে কিনে রাখে। বামুনপাড়ার সবাই কেনে। সবাই ভালোবাসে তুলোবুড়িকে। মাটির বাড়ি। মাটির দাবা। ঝকঝকে তকতকে করে রাখে বুড়ি। সামনে উঠোনে কাপাসের জঙ্গল। তাতে থোকা থোকা বাসন্তী কাপাস ফুল। কান ফেটে বকের মতো বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে। এই-ই বুড়ির মজুত ভাণ্ডার। সেখান থেকেই তার রুজিরোজগার। সব কিছু।

কাগাপাড়ায় গাজিদের বাড়ি। বড়োলোক গাজিদের শুধু সেজ গাজিই দেশে থাকে। তাঁর নাতি আক্কাজ। আক্কাজ পড়ে সুদর্শনের

সঙ্গে স্কুলে। প্রথম দিনে আক্কাজ আর সে পাশাপাশি বসেছিলো—গোটা স্কুল জীবনই তারা পাশাপাশি বসে এসেছে। একজন প্রথম, তো অন্য দ্বিতীয়। এতেও বন্ধুত্ব অটুট। একদিন না দেখা হলে চলতো না। টিম তৈরি হলো। সেভেন বুলেটস। তার নন-প্লেয়িং ক্যাপটেন বেশিরভাগ সময় সুদর্শন। আসল ক্যাপটেন আক্কাজ। সেনটার ফরওয়ার্ড খেলে। তাকে রোখা খুব কঠিন। এছাড়া আছে শক্ত সিংহ ব্যাক। তিনজন ফরওয়ার্ড। দুই হাফ। একজন গোলি, ব্যাক একজন। মোট সাতজনের এই সেভেন বুলেটস, বাস্তবিকই, অজেয় টিম হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। দখ্নো এলাকার কোথায় না খেলতে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা টুরনামেন্টে এনট্রি করা হচ্ছে। কোথার রক্তাখাঁর মাঠ, কোথায় সূর্য্যিপুরের বড়োদোলের মাঠ, কোথায় জয়নগর, মথ্রোপুর, সরষে, রায়দীঘি। সর্বত্র। তাছাড়াও স্কুলের খেলা তো আছেই। স্কুলে আক্কাজ একজন অবশ্য প্লেয়ার। অসুবিধের মধ্যে ওর হাইট। অনেক সময় বলে ঠিক মতন মাথা পায় না। তাতেও ওকে রোখা দায়। যেন তেন প্রকারেণ গোল ও করবেই। ভিজে মাঠে ও আরো মারাত্মক।

সেই আক্কাজ, বলা নেই কওয়া নেই—বিদ্রোহ করে বসলো।

না, তোমার দলে আমার আর খেলা হবে না।

কেন? আকাশ থেকে পড়লো সুদর্শন।

অসুবিধে আছে।

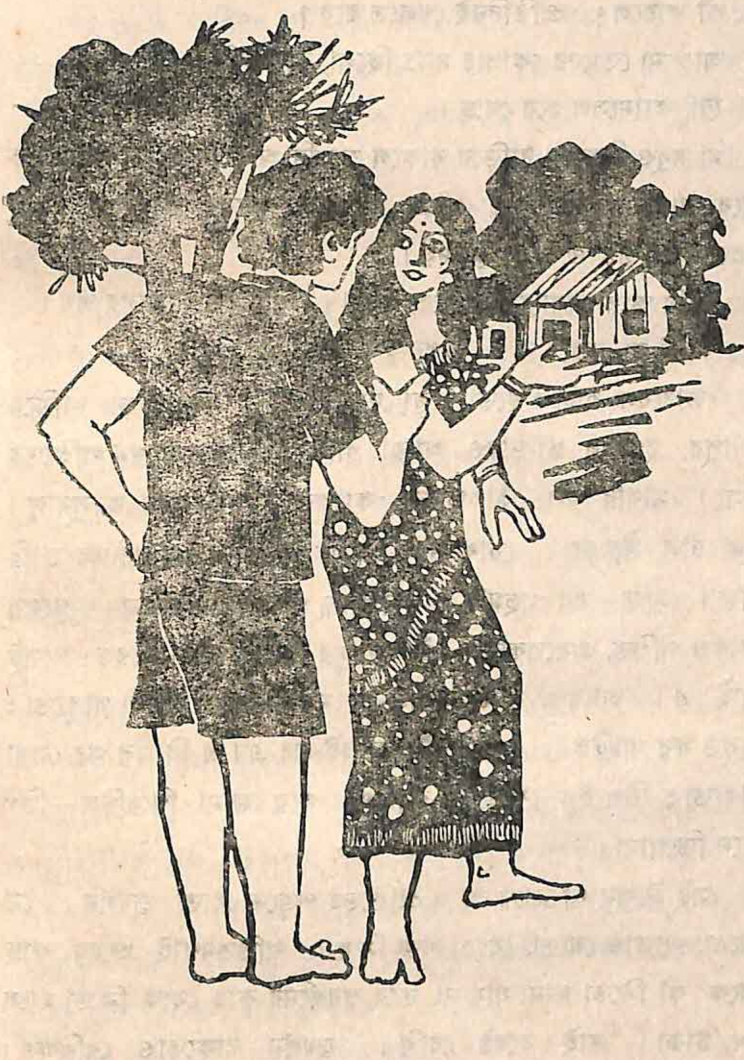
কী অসুবিধে আক্কাজ?

আমাদের একট আলাদা দল হচ্ছে—সেভেন মুসলিমস। তাতে আমিই ক্যাপটেন।

এখানে তো তুমিই ক্যাপটেন আক্কাজ!

তবুও।

সুদর্শনের সেদিনের মানসিক অবস্থা কহতব্য নয়। বাড়ি ফিরে চুপচাপ দাবায় বসলো বইপত্তর নিয়ে।



কী রে ? শরীর খারাপ নাকি ?

না।

তাহলে ?

কী তাহলে! প্রতিদিনই খেলতে হবে ?

আজ না তোদের কোথায় ম্যাচ ছিলো, বলেছিলি ?

হ্যাঁ, ক্যানসেল হয়ে গেছে।

মা তবুও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সুদর্শন আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ঝরঝর করে কেঁদে ফ্যালে। মায়ের কাপড়ের একটা অদ্ভুত মা-মা গন্ধ ওকে শান্তি দেয়।

আমি আর খেলাধুলো করবো না মা। ওটা বড়লোকদের শখ।

করবি না, করবি না। এখন চুপ কর।

ভোরবেলা হাঁটতে হতো পাক্কা দেড় ক্রোশ। কাগাপাড়া ছাড়িয়ে দুর্গাপুর, দুর্গাপুর ছাড়িয়েও আরো খানিকটা গেলে ঈশেন পণ্ডিতের বাসা। মাথার চুল কোঁকড়ানো, কাকের বাসার মতন আলুথালু। এক ঢাল উঁচু চুল। চোখা নাক, রোগা পাতলা শরীরে কণ্ঠস্বর ভারি তীক্ষ্ণ। নস্যি নেন মুহুর্মুহু। কাপড়ের ওপর নিমে পরনে। স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত, প্রসপেকটাসে ওঁর নামের পাশে লেখা ঃ রেড আপটু আই এ। আরেক মাস্টারমশাই-এর নামের পাশে লেখা থাকতো ঃ প্লাক্‌ড ফর ম্যাট্রিক। হেড-মাস্টার-মশাই-এর এম এ বি টির পর লেখা থাকতো ঃ ডিপ ইন স্পোকেন ইংলিশ। পরে জানা গিয়েছিল—ডিপ মানে ডিপ্লোমা।

সেই ঈশেন পণ্ডিতের কাছে প্রাইভেট পড়তে যেতো সুদর্শন। সে যেতো, আক্কাজ যেতো, যেতো শক্ত সিংহ। পণ্ডিতমশাই ওদের কাছ থেকে কী নিতো জানা যায় না, তবে সুদর্শনের কাছ থেকে নিতো মাসে দশ টাকা। তাই যথেষ্ট বেশি। সুদর্শন থাকতোও বেশিক্ষণ। পণ্ডিতমশাই ওকে একটু অন্য চোখে দেখতেন। বলতেন, তোকে জেলায় দাঁড়াতে হবে। পারবি তো ?

দেখি স্যার।

দেখি আবার কী? কনফিডেনস্ না থাকলে আমার কাছে আসিস না, দূর হয়ে যা।

ওঁর ছেলে বারিদও থাকতো সময়-সময়ে। স্কুলে বারিদ একক্লাস উঁচুতে পড়তো বলে একটু ডাঁট। ওর বোন রমার কোনো ডাঁট ছিলো না। রমা নিচুতে পড়তো এককাস, তাই হয়তো ডাঁট-ফাঁট দেখানোর কথা তার না। বরং, সবাই চলে গেলে পণ্ডিতমশায়ের কাছে যখন সুদর্শন একা, তখন রমা একবাটি মুড়ি নিয়ে এসে বলতো, মা পাঠালো।

পণ্ডিত বলতেন না কিছু। খাতার ভুল দেখতে ঝুঁকে পড়তেন। সেই ফাঁকে রমা এক টুকরো পেঁয়াজ তুলতো কোঁচড়ের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে, তারপর চট করে ফেলে দিয়ে বলতো, এ্যাঁ এ্যাঁ···মনে করো এ বি সি একটি ত্রিভুজ—এ্যাঁ এ্যাঁ।

রমা ন-হাতি লাল ডুরে পরতো। নাকে নাকচাবি। ছোট্ট এক টুকরো মুখ। মাগুর মাছের মাথার মতন তেলতেলা। একটু ঝগড়ুটে ছিলো মেয়েটা। ঘাড়ের ওপর জ্বলন্ত কালো তিল ছিলো তু-তুটো। একদিন সুদর্শন ছ্যাখে।

তোমার ঘাড়ে তিল। তুমি ঝগড়া করো নাকি?

তাই বাটি বাটি মুড়ি দিই? কাল দেবো'খন। খেয়ো।

প্রমাদ গনে সুদর্শন। সত্যিই ভীষণ খিদে পায় ওর প্রতিদিন। অতোখানি হাঁটা। তাছাড়া ভোরে তো সেই ফাঁপা মুড়ি খেয়ে আসা। সেই কখন! কাগাপাড়া পর্যন্ত পৌঁছুতেই পেটের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় করে। একটা ফাঁকা বাতাস বুকের দিকে ঠেলে ওঠে। গিয়েই এক ঘটি জল চায় সুদর্শন।

কাল একটু তেল ছড়িয়ে দিও রমা।

নিশ্চয়ই। কোথায় ছড়াবো?

কেন, মুড়িতে?

মুড়ি তোমায় আর দিচ্চেটা কে ?

কেন, মাসিমা ?

আচ্ছা, খেয়ো।

সেদিন রমা আর পড়তে এলো না। এলো না আক্কাজ। শক্ত এলো।

কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো সুদর্শনের। কারণটা ঠিক বুঝতে পারলো না। ফাঁকা। অথচ কেনই বা ফাঁকা হবে ?

শেষ পর্যন্ত মুড়িও এলো না। এলো না রমা। তেল ছিটিয়ে দেবার কথা মনে পড়ে গেলো ওর। একটা দিন তেল দিতে পারতো। আর দিতে হতো না। মুখ ফুটে বললো, তবু রমা—!

ঈশেন পণ্ডিত বললেন, সুদর্শন, তুমি আসচে হপ্তাটা এসো না। শক্তকে বলতে ভুলে গেলাম। তুমি বলে দিও। আক্কাজকে বলেছি। রমার বিয়ে। খুব ভালো পাত্তর পেয়ে গেলুম হঠাৎ। গৌরীদানের মতন দেখালেও, এই বয়েসেই বিয়ে হওয়া উচিত মেয়েদের। তাছাড়া, জানিস তো ওর মাথায় কিছু নেই। মেলা পড়াশুনো করে করবেটা কি ? গ্যাটম্যাট করে চাকরিতে তো আর যাচ্ছে না ? কী বলিস ?

সুদর্শন আবার একবার ভাবলো, বড্ড গরিব ওরা। একবাটি করে মুড়ি পাচ্ছিলো—তাও কপালে সইলো না।

দরজা দিয়ে বেরুতে যাবে, এমন সময় বাগানের দেয়ালের কাছে ফিসফিসানি, এই শোন্, এই শেষ—একমুঠো মুড়ি নিয়ে যা, পালা। আমার বিয়ে, জানিস তো ?

জানি।

কর তোরা বোকার মতন পড়াশুনো। আমি ফ্রী।

তারপরই হি হি করে হাসতে-হাসতে রমা গাছপালার মধ্যে ছাওয়া। ওদিন আসিস কিন্তু, নইলে রাগ করবো। আসিস আসিস আসিস—

মুক্তিপণ

পাটকিলে রঙের চিল একটা নারকোল ডেকলোয় বসে। ঠিক দুকুরবেলা। আকাশ থই থই করছে রোদ্দুরে। চৈত্রমাসের বাদায় শুধু নাড়া। কোথাও কোথাও নাড়া ভেঙে লাঙলের ফাল গেছে এক-আধবার। খেসারির চাষ এতেই হয়। যত্ন-আত্তি বেশি লাগে না।

সুমন দুপুরে তক্তাটা টেনে আনে জানলার ধারে। পশ্চিমমুখো জানলা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এটা-ওটা দ্যাখে আর ডানহাতে কাগজের ওপর আঁকিবুকি কাটে। জানলার নিচে টালিখোলা। তেতে আগুন। এক ডেলা থুতু ফেলা মাত্তর শুকিয়ে যায়। টালির দুটো ঘরের একটা রান্নার, অন্যটা ভাঁড়ার। তার পাশে কলঘর, চৌবাচ্চা। তার পাশে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আধতলা গেলে পায়খানা। ছাতে রং-এর টিনে কাঁকর-মাটিতে বাজবরণ। এক ধরনের ক্যাকটাস। বাজ পড়লে এই গাছ নাকি তাকে সাপটে টেনে নেয়। নিয়ে হজম করে ফেলে।

এ সবই সুমনের শোনা কথা।

না, বাজ পড়তে সুমন দ্যাখে নি। জীবনমল্লের হাটে রোগী দেখতে যাবার পথে দাদু একটা তালগাছের পোড়া কালো মাথা দেখিয়ে বলেছিলো, সেদিন বাজ পড়ার কথা বলছিলে না? দ্যাখো, ওটাতে বাজ পড়েছে। একেবারে মরেই গেছে গাছটা। ওটাতে আর ডালপাতা গজাবে না। বাসা বাঁধবে না বাবুই।

দাদুর তিনঠেঙে ঘোড়া চেপে গ্রামে-গঞ্জে রোগী দেখে বেড়ায় সুমন আর সুমনের দাদু। গাঁয়ের লোকের ত পয়সাকড়ি নেই, তারা ফীর

বদলে কেউ দেয় এককাঁদি কলা, কেউ দুটো আনারস, কেউ একটা ঢাকের মতন লাউ, কেউ বা পুকুর থেকে জাল ঠেঙিয়ে একটা-দুটো পোনা মাছ। দাদু থলে ভর্তি এইসব সাতসতের জিনিস নিয়ে ঘরে ফেরে। মাছের দুটো মুড়োর ভাগীদার দুই দাদু-নাতি। বাড়িতে আর আবার লোক কই? বালবিধবা মাসি নিজের জন্যে নিরামিষ রেঁধে সিঁড়ির ঘরে সরিয়ে রেখে, তারপর আমিষে হাত দেয়।

একতলা হলেও বিশাল বাড়ি সুমনদের। ঘরের পর ঘর। বারান্দার পর বারান্দা। ঝকঝকে উঠোন। একপাশে কুয়োতলা। কুয়োতলার পাশেই গোয়াল। গেটের মাথায় আইভিলতা। দুপাশে ফুলবাগান। দাদু নিজেই নিড়ুনি নিয়ে রোজ বাগানে যায়। সুমনকেও ঘাস তুলতে হয়। মুথা ঘাসের শিকড়ে কী অদ্ভুত গন্ধ! গর্ত করে সেই গর্তে চা-পাতা জমা করা হয়। বাগান ঝেঁটিয়ে পাতাপুতা। অল্পস্বল্প সর্ষের খোল। এই সবটা মিলে জুলে পচে ওঠে। সার হয়। এরই মধ্যে খানিকটা গোবরও মেশানো হয়। বিশেষ করে গোলাপের জন্যেই এতো যত্ন-আত্তি। কতরকম যে গোলাপ ফোটায় দাদু

বাড়ির সামনের জমিটা রেলের। তারপরই পোর্টারের লালকুঠি। আর তারপরই ইস্টিশান। দুদিকে উধাও সুরকির ঢালাও প্লাটফরম। কোলে রেললাইন। পাশেই আকন্দ ঝোপ। বাবলার সার। তারপর বাদা রেল বিল পর্যন্ত একটানা চলে গেছে। বিলে নানা রং-বর্ণের পাখি। বালি হাঁস। পানকৌড়ি বিলের জলকে কাঁথার মতন সেলাই করে গোটা দিন। কী কুচকুচে রোগা কাকের মতন চেহারা ওদের। পদ্মের নালের মতন লতপতে গলা। সুমনের মনের ভেতরকার ইচ্ছে, ওদের পুকুরে পানকৌড়ি উড়ে এসে জুড়ে বসুক। তাহলে দোতলার জানলা দিয়েই তাদের অনেক কাছ থেকে দেখা যায়। কিন্তু, পুকুরে যে কেন পানকৌড়ি বসে না, জানে না সুমন। একে-তাকে শুধিয়েও ঠিকঠাক জবাব পায় না।

সুমনদের গোয়ালে এখন দুটি গাই। রবির রং কালো-বেগুনি মেশা। অন্যটি বেঁটে জাতের দিশি গাই। তার কোনও নাম-ফাম নেই। সুমনের দিদিমা মারা গেছেন বছর দুই আগে। তাঁর বাঁ গালে রাঙা জড়ুল ছিল। রবির পেটেও তেমনি জড়ুল। রবির দুধ বটের আঠা। জামবাটি ভর্তি সেই দুধ দাদুর সামনে সুমনকে গিলতেই হয় রোজ। দু-তিনটি রঙিন বাতাসা ভাসে তার ওপর। পুকুরে ডেমরেল মাছ ড্যাবা ড্যাবা চোখ তুলে চষে বেড়ায়। বাতাসা কটা অনেকটা ওদের মতন।

সুমনের নিজের বলতে বুধি নামের ছাগল ছানা একটি। তার জন্যে কাঁটাল পাতা কুলো ভরে আনে বাগান থেকে। দু-আঁটি ঢলঢলে ঘাস আনে। সকালে ছোলা ভিজানো, গুড় দিয়ে। দু-তিনটে মুচি ডাব আনতে বলে বাড়ির রাখালকে। নরম কুরচিগুলো বুধি নিচের পাটি দিয়ে কেমন কুরে কুরে সাবাড় করে। ডাকলেই তিড়িং-বিড়িং করে সুমনের পাশটিতে এসে পা ছড়িয়ে শোয়। সাদা-কালোয় তাকে ভারি সুন্দর দেখায়।

সুমন হয়ত ধারাপাত বিছিয়ে বসে। বুধি মাঝে মাঝে ঢোলকলমি কান পটাপট ওর দিকে তাকায় আর পরক্ষণে মুখ গোঁজে পেটের গর্তে।

বারান্দায় রোদ্দুর এসে পড়েছে কুমড়ো ফালির মতন। সুমন উঠে গিয়ে পুকুরপাড়ে। আজ খিড়কিতে জাল ফেলা হচ্ছে। কাল রোববার। কলকাতা থেকে ভাই-বোনেরা আসবে ফার্স্ট ট্রেনে। সঙ্গে আর কে আসে না আসে! মাছ ধরে চৌবাচ্চায় জীইয়ে রাখা হবে। মা মামীরা আসবে না। ছোটরা আসবে। সুমনদের খিড়কি পুকুরে মাছ থিক থিক করে। দু ক্ষেপ জাল ঠ্যাঙালেই যথেষ্ট। রুই-কাতলার সঙ্গে কিছু জিয়ল মাছ ওঠে। সিঙ্গি মাগুর খলসে আর বিস্তর চ্যালা ও পুঁটি। দাদু খুব ছোট মাছ ভালোবাসে। ঝালে ঝোলে অম্বলে এক পাহাড় ছোটমাছ দাদু খেয়ে ফেলে। সুমনের



জন্যে কড়কড়ে ভাজা হয়। পুঁটি বড় না হলেই তিতপুঁটি। সেক্ষেত্রে চ্যালা মৌরলার স্বাদই আলাদা।

নতুন ধারাপাত বইটার প্রায় অর্ধেকের ওপর খেয়ে ফেলেছে বুধি। ও সুমনের সঙ্গে পুকুর পাড়ে যায় নি। এখানে থিতু হয়ে এ-কম্মটা করে গেছে নিপুণভাবে।

মাসির সামনে পড়ে গেছে বলেই বুধিকে এক চাপড়ে দাবা থেকে ফেলে দিল সুমন। কিন্তু, মনে মনে বেজায় খুশি। ১৩-র নামতা নিয়ে আজ না হোক তিনদিন হল। কিছুতেই মনস্থ হচ্ছে না। বুধি এভাবে বহুবারই সুমনকে বাঁচিয়েছে।

মনে আছে, গত বছর দাদু এক পণ্ডিত মশাইকে এনে ফেললেন সুমনের জন্যে। এঁর কাছে নাকি সুমনের মা-মাসিরাও পড়েছিল। বুড়ো ফোকলা পণ্ডিত মশাই ভাল কপিং পেনসিল বাতিল করে দিলেন। কেটে দিলেন সরুমোটা কঞ্চির কলম। দোয়াতের কালি কাঠকয়লা ঘষে তৈরি করে নিতে হল। এক তাড়া পাকা তালপাতা এল। তার ওপর গোটা গোটা করে লেখা চলতে লাগল। সকাল বিকেল।

পণ্ডিতমশাইয়ের জন্যে আফিম আর দুধের ব্যবস্থা আর কানে দেবার জন্যে কানবালিশ। এক বিঘৎ চেহারার দু-দুটি বালিশের একটিতে নিচের কান রেখে, উপরে হাতে চেপে আরেকটি। যাতে সুমনের পড়া-পাঠ প্রভৃতি যাবতীয় গোলযোগ তাঁর বিশ্রামের বিঘ্ন না করে। এরকম বেশিদিন যায় না, যেতে পারে না।

সুমনের ভাই ব্রাদাররা এসে দেখল, সঙিন অবস্থা। দাদাকে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করতেই হয় তাহলে। ওদের সঙ্গে এসেছিল দূর সম্পর্কের এক মাসতুতো ভাই নিশুদা। সেই-ই বড় বলতে বড়। গাইড বলতে গাইড।

এইটে দু-দুবার গাড্ডু মারায় বড় মামা ওকে প্রেসের দপ্তরিখানায় বইপত্তরের শিরদাঁড়ায় আঠা লাগানর কাজে জুড়ে দিয়েছেন। নিশুদা ছাড়া বাকি তিনজনই সুমনের কেউ তিন কেউ চার মাস ছোট।

সবাই তু মামার ছেলেপুলে। কলকাতার উত্তরে হাওয়ায় বিটকেলে, বাড়ন্ত। সুমনকে স্পষ্টই বলে, তুই হলি গরু ছাগল পুকুর ডোবার মতন নিষ্কর্মা। আপিংখোর পণ্ডিতটাকে হাটাতে পারছিস না? ধ্যুৎ!

সুমনের সঙ্গে দাতুও ইস্টিশানে ওদের রিসিভ করতে গিয়েছিলেন। ওরা ফিরে দ্যাখে, বাদামতলায় দাতুর ঘোড়া তৈরি। বললেন, সুমন তুমি ওদের সঙ্গে থাকো আজ। আমার ফিরতে এই তুপুর হবে। হাছিনপুরে মড়ক লেগেছে। ওলাউঠো আর কি? রাখালকে নিয়ে যাচ্ছি। শ্রীমন্ত ত রইলোই। শ্রীমন্ত দাতুর খাস চাকর। স্নানটান কিন্তু তোলা জলে সারবে। পুকুরে নাববে না। সুমনের বাবা গতবছর মারা গেছেন। সেই থেকে দাতুর কাছে। মা মামা বাড়িতে থাকেন। সুমন দাতুর সঙ্গে শহরে যায় মাকে দেখতে। দাতু খুব স্ট্রিকট। তাই একবছরে মাত্র তুবার মাকে দেখতে যেতে পেরেছিল। পরের বছর থেকে ইস্কুল। তখন দাতু বলেছেন, রেজাল্ট নিয়ে একেবারে মাকে দেখিয়ে আসবে। প্রণাম করে আসবে। তারপর আবার পরের বছর।

মাসি রান্নাঘরে। কানে একটু কম শোনে মাসি। চোখেও দ্যাখে কম। আজ কলকাতার দখলে এই সুমনের গাঁয়ের গোটা বাড়িটা। পণ্ডিতমশাই এই সাত-সকালেই গামছা কাঁধে পায়ে খড়ম হাতে গাড়ু পুকুরের দিকে চলেছেন। সুমনকে ইশারায় ডেকে বললেন, আজ তোর ছুটি। ফুর্তি কর। ওরা এসেছে। সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে আজ একটু মজিলপুর যাব বুইলি? আসব কাল।

যে আজ্ঞে।

মজিলপুরে পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি। বাড়িতে ছেলে-বউ রাখতে চায় না। তবুও উনি যাবেন!

তা যান না। তোর কী?

শ্রীমন্তকে ভজিয়ে পণ্ডিতমশাই একটা পুঁটুলি বানিয়েছেন। বেশ ছোটখাট পাহাড়-টিলার মত। সুমনকে দরজার পাশে পাহারায়

বসিয়ে ওরা নিশুদার লিডারশিপে তাঁর ঘরে। তারপর দূর থেকে ততটা দেখতে না পেলেও সুমন মহাকাণ্ডের আঁচ পেয়েছে। দু-ছড়া কাঁচকলার বদলে কিছু ইঁটপাথর। ঝুনো নারকেলের বদলে খাওয়া ডাবের খোল। এক পালি চিড়ের বদলে সুরকি। এইভাবে বদলাতে বদলাতে সব আসলের জায়গায় পুরো নকল। এমনকি শেষপর্যন্ত নিশুদা যখন আফিং এর বড়ির বদলে বুধির নাদি কৌটোয় ভরল, সুমন আর থাকতে পারল না।

কেঁদেই ফেলল ছেলেটা। ছিঃ ছিঃ এতটা চায়নি! মুক্তিপণ দিতে এতটা হেনস্তা পণ্ডিতমশাইয়ের হোক, সে কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু, কিচ্ছু করার নেই তার। তারই মধ্যে কে একজন তালপাতার তাড়া আর কঞ্চির কলম মাসির উনুনে পুরে দিয়ে এসেছে। মাসি 'কেরে কেরে' চেঁচিয়েছে। গোটা গ্রামের বাড়িটাই এই এক ঘণ্টায় কলকাতার দখলে চলে গেছে। সুমনের টঁ্যা ফুঁ করার জো নেই।

পণ্ডিতমশাই আর ফিরে আসেন নি। ছেলের বউ এরকম উপঢৌকন পেয়ে তাঁকে কি আর আস্ত রেখেছে?

চলো আমার সঙ্গে

ওর তিতি নামটি কেমন করে হলো, সে-গল্পটাই আগে বলি। তারপর তো ও তোমাদের সঙ্গী, কিংবা তোমরা ওর সঙ্গে কোথায় না কোথায় ভেসে চলবে। ভেসে চলবে নৌকোয় জাহাজে। ছুটে যাবে রেলগাড়ি মোটরে জিপে—যাবে কোথায়? কখনো জলে জঙ্গলে নদীনালায়, কখনো পাহাড় উপত্যকায়। কখনো কোনো অভয়ারণ্যে, কখনো ভয়ানক অরণ্যে। এইভাবে। কখনো ও তোমাদের সঙ্গী। কখনো তোমরা ওর সঙ্গে।

খরগোসের তুটো কানের একটা কান হলো ভুটান। ভারতবর্ষের বন্ধুদেশ। রাজা আছেন, রাণী আছেন, আছেন অনেকানেক পারিষদ। সেই দেশটি ঠিক তোমার বাংলাদেশের কাঁধের উপর। খরগোসের একটা কানের মতো জেগে। বাকি কানটাকে নেপাল ধরো। তার কথায় পরে আসা যাবে। এখন, যাকে নিয়ে আমাদের গপ্পের শুরু হতে যাচ্ছে, তার কথায় আসি।

পাহাড় জঙ্গলে-ভরা ঐ ভুটানের একটা দিক জলপাইগুড়ি থেকে খুবই কাছে। বাস আছে। সুন্দর পীচের চওড়া রাস্তা। কখনো চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কখনো ধানক্ষেত মাড়িয়ে, ছোটবড় ঝোবরির উপর দিয়ে ডিঙি মেরে হাঁটছে। পথের তুধারে শিশুগাছ, শিরীষগাছ আর শাল সেগুন। চেনা গেরস্ত গাছও বিস্তর। আম কাঁঠাল জাম। গোটা পথের উপর ছায়ার জাল বিছিয়ে রাখা। ছায়া আর আলোর।

সেই সুন্দর মিঠে পথ ধরে বাস তোমায় নিয়ে যাবে চামুরচি।

ওটা আমাদের দেশের সীমা। তারপর ভুটান শুরু। কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক তার পরেই কিন্তু ভুটান শুরু হতে পারে নি। তোমরা অবাক হচ্ছো তো? ভাবছো, এ আবার কী কথা? তাই আবার হয় নাকি? হয় কিন্তু, সত্যিই হয়।

দুটো দেশের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা সবসময় পড়ে থাকে, তার নাম 'কেউ-কারুর-না জমিদারি'। ইংরিজিতে থাকে বলে 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড'। চামুরচি আর সামচির ঠিক মাঝখানে এমনি খানিকটা ফাঁকা জমি আছে। এই ফাঁকা জমি ভর্তি আছে বুনো জংলা শটিক্ষেত। তারপর পথ পেঁচিয়ে উঠেছে পাহাড়ে। পীচের পথ। একদিকে পাইনগাছের সারি। অন্যদিকে খাদ। এলোমেলো হাওয়া। মনে হবে, পাহাড়ে কে যেন সদাসর্বদা কেঁদে ফিরছে। পাইনবনের ফাঁকে বাতাস এমনি করেই কাঁদে। আগেভাগে জেনে রাখলে আর ভয় করে না। ভাবনা হয় না।

সিঁড়িভাঙা অংকের মতন চাষবাস আর ঘরবাড়ি ছড়িয়ে। বনের ভিতর থেকে হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে মনে হবে তোমার। তুমিও যেতে-যেতে উঁকি মেরে দেখছো। এভাবে লুকোচুরি উঁকি-ঝুঁকি দিতে-দিতে পৌঁছুবে গিয়ে সামচির বাজার অঞ্চলে।

টাকের মতন, টেবিলের মতন ফাঁকা মাঠ একটি। তার তিনপাশে বাঁধা ঘরবাড়ি। আকারে ছোট। সবই দোকান। খাবার জায়গা বিশেষ নেই। সবাই ওখানে বেড়াতে যায়। ওখানে একটি নদী আছে। বর্ষায় ভয়ানক হাঁকডাক তার। শীতে শান্ত। প্রায় নির্জলা নদী। চওড়া বুক জুড়ে কেবল পাথর আর পাথর। ছোট বড়ো সেজো মেজো পাথর। কী তাদের রঙ-বর্ণ! কী তাদের ছুরৎ। দেখলে চোখ জুড়োয়।

সেই খাদে দল বেঁধে নেমে হয় চড়িভাতি। উত্তরবাংলার ইস্কুল-পাঠশালা ট্রাকভর্তি হয়ে ডায়নার খাদে গোটা দিন হৈ-হুল্লোড় করে, সন্ধেয় বাড়ি ফেরে।

পড়ে থাকে ভাঙা হাঁড়ি, পোড়া কাঠ, শুকনো শালপাতার রাশি। এলোমেলো হাওয়া সেই দিনের স্মৃতি রাতভর ওড়াতে-পোড়াতে থাকে। পাইনের বনে কে যেন কেঁদে বেড়ায় গোটা রাত।

সামচিতে ভারতের জিওলজিক্যাল সারভের একটি আপিস আছে। ভুটানের হয়ে এরা কাজ করতে এসেছেন। ভুটানের মাটির তলায় আছে অজানা কতো দামি পাথর। এরা সেই পাথরের খোঁজ দিচ্ছে। কীভাবে তুলতে হবে পাতাল থেকে মর্তে, তার উপায় বাতলাচ্ছে। হিসেব কষে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে একদল বাঙালী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে। ঘরবাড়ি আছে। অতিথিশালাও আছে। তবু সবার ঘরই অতিথিশালা। কারুর দোরে গিয়ে দাঁড়ালে সে হাতে চাঁদ পাবে। এই সামচি থেকে একজনের মা-বাবা একবার জিপে করে বেরিয়ে পড়লো। সেই একজনের নাম এক্ষুনি আর বললাম না। পরে তো বলতেই হবে। তোমরা আন্দাজ করতে থাকো ততক্ষণ।

মা-বাবা চললো, সেই একজনের বাবা যিনি, তারই বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুর নাম ধরো যযাতি। এই যযাতি যার নাম, তার কাজই হলো মাটির নিচেকার সলোমনের রত্নখনির সন্ধান করে বেড়ানো। খোঁজ দেওয়া। কী করে বা পাতাল থেকে তুলে আনা যাবে, তা বুদ্ধি খাটিয়ে বের করা।

অনেক জঙ্গল, থরে থরে কেটে-যাওয়া ছানার ডেলার মতন চা-বাগান পার হয়ে তারা চলছে তো চলছেই। সেই কোন্ সকালে দুমুঠো ভাত-ডাল পেটে ফেলে বেরিয়েছে, এখনো থামার নামটি নেই। জিপগাড়ি ছুটেছে তো ছুটেই চলেছে। ক্বচিৎ দেখা যাচ্ছে লোকজন। নদী পার হচ্ছে নদীর বুকে নেমে পড়ে। পাহাড় পার হচ্ছে পাহাড়ের বুকে ঝাঁপ দিয়ে! এ আবার কেমন যাওয়া রে বাপু। যাচ্ছেই বা কোথায়? সামনে শুধুই বনজঙ্গল। জঙ্গলের পিছনে সরস্বতী ঠাকুরের পিছনকার তৈরি-পাহাড়ের মতন খেলনা পাহাড়ের দাগ।



নীল-কালো দাগ সমস্ত। সবই নাকি ভুটান পাহাড়। আলাদা আলাদা নামও হয়তো আছে। কিন্তু, তা এতোই খটোমেটো যে, বারবার শুনেও মনে থাকে না। ভাষাটাই যে কেমন কেমন!

সেই একজনের বাবা-মা এবং বাবার বন্ধু, যিনি নাকি সলোমনের রত্নখনির সন্ধানে আছেন, তারা তিনজন একটা সময়, এই দুপুর গড়িয়ে বিকেলে, গাড়ি থেকে ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়লেন।

এই নদীটা হেঁটে পার হতে হবে আমাদের।

তাই হোক। আর বসে থাকা যাচ্ছে না। গা গতর পাথর হয়ে গেছে!

এই নাকি নদী! জলের বিন্দুবিসর্গও কোথাও নেই। খাত ভর্তি ইয়া বড় বড় সব পাথর। জলে ধাক্কা খেতে-খেতে গা-তেলালো পাথর সব। তারই মধ্যে হুড়মুড়িয়ে জিপ নেমে গেলো। পিছনে ডাঁই-করা সব বস্তা স্যুটকেশ তোরঙ্গ তেরপল—আরো সব কী কী যেন।

নদীর এপার থেকে ওপার বেশিক্ষণের না। মাঝখান দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথের রেখা যেন। রত্নখনির খোঁজে তো আর কেউ একা আসতে পারে না? তাই সঙ্গীরা আগেভাগে এসে বসে আছে। পরে শোনা গেছে, ওরা নাকি ছ' মাসের উপর আছে এই জঙ্গলে। মানুষ চোখে পড়ে না। জন্তুজানোয়ার কিন্তু চোখ মেললেই দেখা যায়।

জায়গাটার চতুর্দিকেই খাড়া পাহাড়। মাঝখানটায় গর্ত মতন। সেই গর্তের একপাশে শাদা একফালি ছেঁড়াকাপড়ের মতন নদীটি। বাতাস আছে। বাতাসে শীতের কাঁটাও আছে। রোদ্দুর গাছপালার মাথায় ঘুড়ির মতন আটকে।

নদীর যে-পারে থাকা হবে, তার সর্বত্র চন্দনের বন, খয়েরের বন। চাষ করা হয়েছে। বুনো জংলা কিছু নয়।

সেই বন পার হয়ে তবেই ক্যাম্প। দু-দুখানি ঘর, বসার ঘর, রান্নাঘর—সবই আছে। ঘরে জানলা আছে। ক্যাম্পখাট আছে। আলোর ব্যবস্থা আছে। আয়না-আরশি সমস্তই লাগানো।

জনৈকা বের হয়ে এসে স্বাগত জানালেন। এঁরই অন্য অর্ধের নাম যযাতি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একবাটি করে চা। পাঁপর ভাজা। কাঁচালঙ্কা ভাজা।

রাতে কিন্তু শুধু মুরগির ঝোল আর ভাত। আর কিছু পাওয়া যাবে না।

জিপের পিছন থেকে দিন-সাতেকের রেশন নামলো। সাতদিনে একদিন এই দুর্গম পুব-ভুটানের একাংশ থেকে সামচির সঙ্গে যোগাযোগ। যযাতির মতন যারা, তাদের আকছারই এমন ক্যাম্প করতে হয়। এখানে তো খুব ভালো। জিপে আসা গেছে। এমন জায়গাও আছে, যেখানে মাইলের পর মাইল হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। তাও যে-সে হাঁটা নয়, পাহাড়ের সুঁড়িপথ ধরে চড়াই। ক্রমাগত চড়াই। বর্ষায় মারাত্মক হলো। বাঘ-ভাল্লুক সাপখোপ না, থই থই পাহাড়ে-জোঁক। সে যে কি বিভীষিকা, যাদের অভিজ্ঞতা নেই, তাদের পক্ষে আন্দাজ করাও শক্ত। পাহাড়ি লোক এই জীবটাকে ভীষণ ভয় করে।

আশ্চর্য সুন্দর এই ক্যাম্পলাইফ! পিছনদিকে নদীর খাত একটা গর্ত মতন জায়গায় জল জমিয়ে রেখেছে।

জঙ্গল আর বনবাদাড়ে স্বাভাবিক আড়াল। খিড়কি পুকুরের সামনের অংশ যেন! বরফ ঠাণ্ডা জল। শিবিরবাসী যযাতি পিছন থেকে বলে উঠলো, নদীর নামটি ভারি মিষ্টি কিন্তু।

কী নাম, কী নাম?

তিতি। তিতি। খুব মিষ্টি, না?

মিষ্টি মানে? চমৎকার। নিশ্চয় কোনো মানে আছে কথাটার?

মানে? যযাতি উদাস গলায় বলে, কোনো মানে নেই। আর মানে নাই বা থাকলো। মানে ছাড়াই কি সুন্দর!

॥ দুই ॥

সাধারণ জেলে ডিঙি। একটু ছই আছে। বাতাস জলের ওপর দিয়ে আসছে বলে গরমে চৌচির হয়ে পড়ছে না কেউ। ডিণ্ডি একটা তালপাতার টুপি পরেছে। তাল কি, খেজুর—ঠিক আলাদা করা যাচ্ছে না। এ ধরনের টুপির নাম সুলিয়া-টুপি। ওরা যখন জলে নামে, তখনও ঐ টুপি পরে থাকে। টুপির ভেতরে থাকে বিড়ি দেশলাই—সর্বস্ব, ম্যয় কাগজের এক টাকা দু টাকার নোট। আশ্চর্য, ভেজে না। যেমনটা, ঠিক তেমনটা থাকে। টুপির ভেতর এক ফোঁটাও জল ঢোকার উপায় নেই—এমন ঘেঁষাঘেঁষি করে পাতাগুলো বোনা। ওরা নিজেরাই বোনে। যেমন, ডিণ্ডি দেখেছে, ওরা হুড়মুড়িয়ে কীভাবে নাইলনের জাল বোনে। একসঙ্গে চার পাঁচ জন এদিকে ওদিকে করে বসে গোটা জালটাই বুনে ফেলে। বোনার পর জোড়া লাগায়। তারপর জাল বাগিয়ে সোজা সুমুদ্দুর।

এখন চিংড়ির দাম খুব। এক একটা মাঝারি মতো বাগদা দেড় দু টাকায় কেনে কোমপানির লোকেরা। তারপর খোসা ছাড়িয়ে মাথা-বাদ চলে যায় টিনভর্তি হয়ে বিদেশে। তাই এতো দাম। আর ডিণ্ডিরা কলকাতার বাজার থেকে সেই দাঁড়া মাথা কেনে। দাঁড়া মাথায় শাঁস মাছ নেই, শীতকালে লাল-হলুদে মেশা ঘিলুও বিস্তর মেলে। মাছ-চিংড়ির কথা আলোচনায় ডিণ্ডির কোনো বিরক্তি-ক্লান্তি নেই। খেতেও নেই। তবে, খুব একটা খেতে পারে না। কতটা আর খাওয়া যেতে পারে, বলো? পেটটা তো আর চার নম্বরী ফুটবল না!

ডিণ্ডিদের নৌকো নিরুদ্দেশে ভাসছে। জল নৌকোর কানা ছুঁয়ে যাচ্ছে। খুব একটা বড়ো তো না? এই মাঝারি গোছের চেহারা। আর ডিণ্ডি একটু ঝুঁকে পড়ে হাতের কোষে জল তুলে গঙ্গা গঙ্গা করে

চতুর্দিক ছিটোচ্ছে। মাঝখানে একটা মন্দিরের মতো ছোট্ট চারকোণা ঘর। কিন্তু, মোটেই মন্দির না। মূর্তিই নেই। এটা যেন জলে ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে নৌকো বেঁধে একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্যেই তৈরি। কিংবা, উঠে বসো। ফ্লাসকে চা-ফা থাকলে দু দশ মিনিট বসে চা বিস্কুট খাও। চারদিক তাকিয়ে দ্যাখো। শীতে পাখির হৈ-চৈ কিচির-মিচির শোনো। আর কী?

জলটুঙ্গিটা ডিণ্ডির ভীষণ ভালো লাগলো। চৌখুপি ঘর। জলের ওপর ভাসছে যেন। কীভাবে যে তৈরি করা হয়েছে কে জানে? নিজের বা কী আছে? মাঝি বলছিলো রাজা এখন অনেকগুলো টুঙি তৈরি করে দিয়েছে। রাজা? কোন্ রাজা? কই তার নাম? কোথাকার রাজা ছিলেন তিনি। দূরে ঐ যে একটা সবুজ পাহাড়-অলা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে—ওর নাম নাকি নল বন। ওখানে রাজার তৈরি একটা মন্দির আছে। শিকার করার জন্যে একটা গম্বুজঅলা মিনার আছে। এখন শীতে পাখির বাসা ঐ জলদ্বীপ। এখন তো তেমন জমপেশ করে শীত পড়েনি। পাখি তবু, ওখানে যাবার জন্যে ডিণ্ডির মনটা আঁকু-পাঁকু করছে। কিন্তু, দূর আছে। যেতেই ঘণ্টা খানেকের বেশি। ফিরতেও ঐ রকম।

বাবাকে বলতে, বাবা বললেন, একবছরের মতন তোলা থাক ডিণ্ডি। আমিও দেখিনি। আবার একবার ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আসবো। বেশ ক'দিনের জন্যে। এসে থাকতে হবে বেশ কটা দিন। সেবার আর এতো ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করবো না। চিলকারানী হাউস বোটে উঠবো। সবকটা দ্বীপ ঘুরে-ফিরে দেখবো। সেবার শুধুই চিলকা। আসবে তো? নিশ্চয়। ডিণ্ডির একটু মন খারাপ হলো। জলের নিচে নানারকম মাছ ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। যেন হাত বাড়ালেই ধরা দেবে। পিঠ উলটে গায়ের বুনো দেখাচ্ছে।

আচ্ছা বাবা, সেই যে উড়ুক্কু মাছের কথা বলতে না, তা কি এখানে দেখা যাবে?

না রে, সে শুধুই সমুদ্রে দেখা যায়। তাও সর্বত্র নয়। তোর সুনীল কাকু বলেছিলো, আন্দামান যাবার সময় জাহাজ থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছ দেখেছে ও।

আমরাও তাহলে একবার আন্দামান যাবো, বাবা।

নিশ্চয়ই যাবো। গিয়ে বেশকিছুদিন থাকতে হবে ওখানে। সে আমি ব্যবস্থা করবো।

খুব জলদি ব্যবস্থা করো কিন্তু বাবা। আমার এক্ষুনি যেতে ইচ্ছে করছে। ডিঙির মা জলের দিকে চোখ নিচু করে কী যেন সব দেখছে। রোদ্দুর আড়াল করার জন্যে মাথায় কাপড়ের খুঁট তুলে দিয়েছে। ভারি সুন্দর লাগছে মাকে ডিঙির। মা যেন ঘোমটা দিয়েছে। ঘোমটা দিতে মাকে ক্বচিৎ দেখেছে সে। দেখেছে কী? মনে পড়ছে না, তেমন করে। তবে, ঘোমটা-টানা ছবি দেখেছে মার অনেক। বাড়িতে ভাসুর-শ্বশুর বলতে কেউ নেই তো! তাই ঘোমটা দিতে হয় না। বড়ো বলতে তো বাবাই। ঠাকুমা আছেন অবশ্য। তবে, ঠাকুমা খুব সিম্পল। অতো ঘোমটা-টোমটার ধার ঠাকুমা ধারে না। ঘোমটা টেনে কী আর কাজকম্ম করা যায়?

ওসব আবার কী? এখন ওসব চলে না।

তবু কোন যুগের ঠাকুমা? তুমি তো বেশ মডার্ন দেখছি! ডিঙি সর্বদা ঠাকুমার পিছনে লেগে আছে! অনা লেখাপড়া তেমন জানে না। তখন ওসবের চল ছিলো না তেমন। তাছাড়া, ঠাকুমার তো বিয়েই হয়ে গেছে ১৩।১৪ বছর বয়েসে। পড়াশুনো করবেটা কখন ছাই!

লেক থেকে ফিরতে-ফিরতে বেশ বেলা হলো। প্রায় মাথার ওপর সূর্য। চৌকিদারকে ডিঙির বাবা সকালেই বাজারে পাঠিয়েছিলো। এখন রেশন হাউসে ফেরার পথে, ওরাও বাজারের দিকে। সোজা পথ থেকে একটু বেঁকে, রস্তার ট্যুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে একেবারে বাজারের মুখে গিয়ে পড়লো ওরা। বাজার মানে তরিতরকারির প্রায়

দেখা নেই, যা আছে তা হলো মাছ আর মাছ। চিংড়ি, কাঁকড়া, মহামাগুর। এতে বড়ো মাগুরমাছ ডিণ্ডি কখনো ছাখেনি।

বাবা বললেন, বাজারে দেখি। কিন্তু, সমস্তই মরা। জল থেকে তোলার পর এরা বেশিক্ষণ বাঁচে না। এমনও হতে পারে, এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যে-পাত্রের দরকার তেমন পাত্র পাওয়া কঠিন। সাধারণ ছোট আর মাঝারি মাগুর তো বহুদিন বাঁচে! মাছঅলাদের জিগ্যেস করতে হবে কলকাতায় ফিরে।

এই রম্ভা রাজ্য, বাবা বলেছিলো, বহুকাল আগে নাকি মেয়েরাই শাসন করতো। মেয়ে-শাসিত রাজ্য! অর্থাৎ মেয়েরাই এখানকার সব। মাছের বাজারটা এক লহমা দেখে ডিণ্ডির এই কথাটা মনে পড়ে গেলো। যারা মাছ বিক্রি করছে, তারা সবাই মেয়ে। আর কি সুন্দর মত দেখতে তাদের! টিকোলো নাক। গায়ের রং আগুন পারা। কাটা কাটা চোখমুখ। হুরী-পরীদের মতন অবিকল দেখতে। মুখে পান আর অবিশ্রান্ত হাসি।

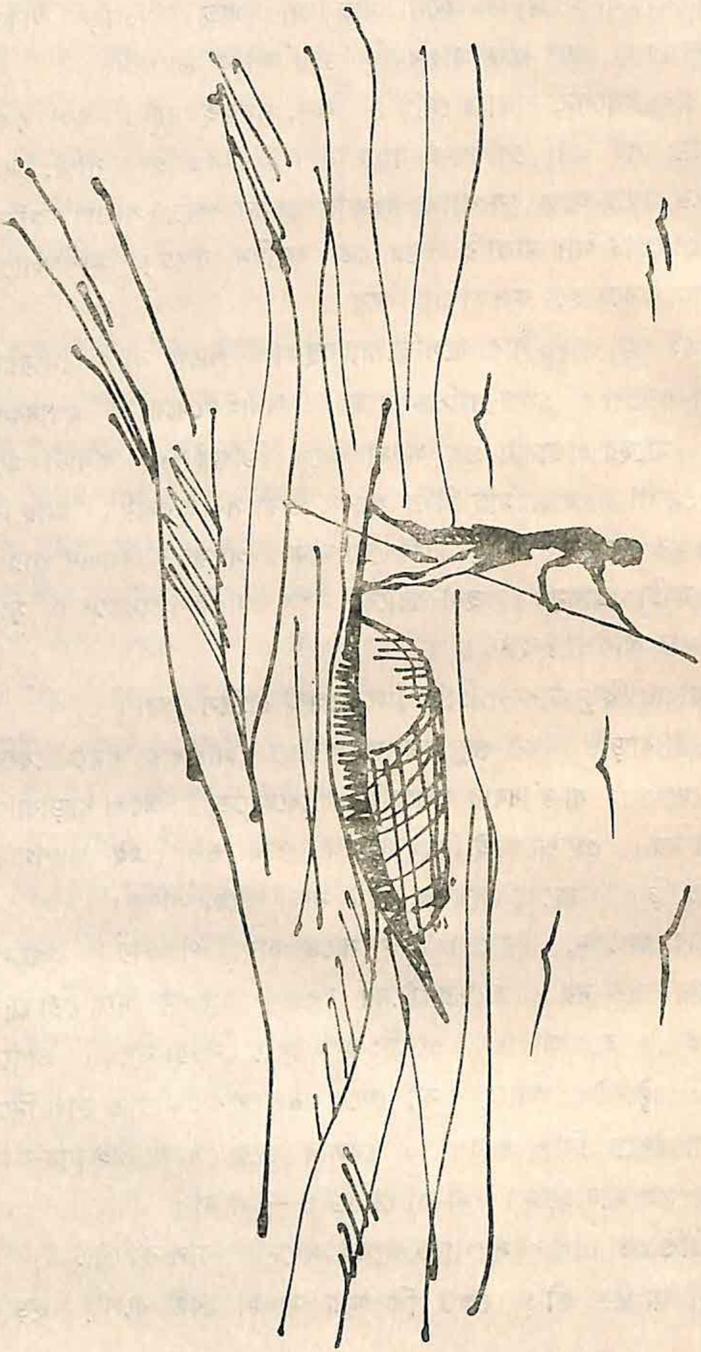
আবার কিছু কাঁকড়া চিংড়ি কিনে গেস্ট হাউসে ফেরা।

এটা বাড়তি। মা শুধু গজগজ করছে, চৌকিদার সমস্ত ফেলে দেবে দেখো। যা রাঁধবার অলরেডি রেঁধেছে তো। এতো বাড়াবাড়ি ভালো নয়। প্রত্যেকেরই বিষম সর্দি। তার ওপর এই গাদাগাদা মাছ চিংড়ি। মানুষের লোভের একটা সীমা আছে, সত্যি।

বাবা বললেন, ট্রেন তো সেই সাড়ে চারটে পাঁচটায়। এগুলো এবেলার জন্যে নয়। রাতের ট্রেনের জন্যে। খুরদায় গিয়ে তো ট্রেন বদল করতে হবে আবার। ওয়েটিং রুমে খেয়ে নেওয়া যাবে। ওখানে একটা রেষ্টুরেণ্টও আছে। কী দেবে, না দেবে। ভাত ডাল নিয়ে এগুলো খেয়ে নিলে হবে। এ বেলার জন্যে তো যথেষ্টই মাছ-ফাছ এনেছে বলে মনে হচ্ছে। না কী রে ডিণ্ডি—বল না?

ডিণ্ডি তো বাপকে সাপোরট করেই আছে। বাপ-কা বেটি।

তা নয় তো কী? কেউ কি আর মা-কা বেটি বলে? ছড়ায়



পড়োনি নাকি ? 'ৰাপ-কা বেটি সিপাই কা ঘোড়া কুছ্ নেই তো থোড়া থোড়া'—বাবা তো সেই ঘোড়ার ব্যবস্থাই করেছে মা। রেষ্টুরেন্টে কী পাওয়া যাবে না যাবে ভেবেই তো বাবা আগে থেকে প্রস্তুত।

চৌকিদার টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছিলো। আমরা বাজারে কৈ মাছ দেখিইনি। তা, দেখবো কী করে ? সবগুলো মাছই যদি চৌকিদার তুলে এনে থাকে।

এখনো শীত তেমন পড়েনি। তবুও, কী তেল মাছগুলোয় ! এক সরু ছড়ির ডিম। ডিম এখনো ভালোভাবে পুরুস্ট হয়নি চৌকিদার কৈ-তেল বানিয়েছে।

মা সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলো, তেল-কৈ বলো। একটা জিনিষ খাচ্ছো, আর তার সত্যিকারের নামটা জানবে না ? ঠিক নয়।

চৌকিদার সরপুঁটি পেয়েছে। চিংড়ির একটা মালাইকারি করেছে। আর সরষে শাক, নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল। ডালের কোনো দরকারই ছিলো না, ডিণ্ডি বলে উঠে।

তা ঠিকই। আমরা একটা পাত্রে রাতের জন্যে নিয়ে নেবো।

রাত্রের জন্যে আর কী কী নেবে ? কিছুই বাদ রাখবে না, দেখছি। কাল ভোরেই পুরী পৌছুবো। মনে হচ্ছে, তোমার খাবারের মেনু কাশ্মীর যাবার জন্যে তৈরি করছেন। তোমার সঙ্গে বেরুনো মানে, শুধু খাওয়া আর খাওয়া। হুঃ, তুমি নাকি আবার পদ্য লেখো। একটা জায়গা দেখে বলতেও শুনলুম না। জায়গাটা কী সুন্দর দেখেছো ? যত্তো সব বানিয়ে-বানিয়ে সুন্দর লেখা। সুন্দর তোমার এই খ্যাটন আর গড়ানো বুঝলে ?

এসময় ডিণ্ডির বাবার কোনো জবাব দেবার থাকে না। কীই বা জবাব হবে ?

এর পর এগুনো পুরীর সমুদ্দুরের দিকে। আগেও বহুবার গেছে ডিণ্ডি। কিন্তু, পুরী যেন পুরনো হবার নয়। থেকেওছে নানান

জায়গায়। হোটেলে ভাড়াবাড়িতে আর বিভিন্ন সংস্থার হলিডে হোমে থেকেছে ওরা বহুবারই। এবারে আগে থেকে কোনরকম ব্যবস্থা না করেই চলেছে। একটা না একটা মাথা গোঁজার জায়গা জুটেই যাবে।

স্টেশন থেকে নেমে রিকসায় উঠলো ডিঙিরা। এবারে তো রিকসাঅলাকে একটা কিছু বলতেই হয়। ডিঙির বাবা বললেন, চলো পান্থনিবাস চলো। আগে দেখা যাক ওখানে জায়গা পাওয়া যায় কিনা। না পেলে অন্যত্র হোটেল ফোটেল খোঁজা যাবে। শুনেছি পান্থনিবাসের ব্যবস্থা ভালো। সরকারি ট্যুরিস্ট লজ তো? তাছাড়া, হয়েছে তো এই সেদিন। নতুন বাড়ি। স্যাঁতসেঁতে কিছু হবে না। ভাড়াও রিজনেবল। রেস্টুরেন্ট এ্যাটাচড।

স্টেশন থেকে রিকসায় চেপে বসামাত্রই একটা অদ্ভুত ধরনের উত্তেজনা পেয়ে বসে ডিঙির। এদিক ওদিক দুদিকের ঘরবাড়ি, বালুর পোড়োজমির মধ্যে দিয়ে রিকসা দৌড়ে চললো। উঁচু থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে যেমনটা হয়, ঠিক তেমনিভাবে গড়াতে গড়াতে রিকসা ক্রমাগত নামছে। সুমুদ্দুরের নীল এখনো দেখা যায়নি। ডিঙি চোখ টেনে বড়ো করে রেখেছে, কখন কোন ফাঁকে সুমুদ্দুর নীল জিরাফের মতন গলা বাড়িয়ে দেয় কোথাও ডিঙি তাকে দেখবেই দেখবে। অন্য সবার চেয়ে আগে ভাগে সমুদ্র দেখবে ডিঙি। এ এক ধরনের ইচ্ছে আর কী? ছোটদের ছোটমটো খেলাই এটা।

পুরীতে গিয়ে পৌঁছুলো সকলে। সুমুদ্দুরের ধারে দেশে শীত পড়তেই চায় না। তবু, গায়ে একটা পাতলা হাতকাটা সোয়েটার লাগিয়ে দিয়েছে মা। রৌদ্র একটু একটু করে বাড়ছে। আর গায়ের ভেতরটা কুটকুট করে উঠছে। তবু, উপায় নেই। রিকসা গড়িয়ে নামছে। হাওয়া কেটে নামছে। তাই বুক বাঁচাতে সোয়েটার খোলা চলবে না। নেমেই খুলে ফেলবে—মনে মনে ঠিক করে রাখে ডিঙি। নামতে নামতে রোদ্দুর চড়চড়িয়ে উঠবে। আশা করি, তখন আর আপত্তি থাকবে না মায়ের দিক থেকে।

পান্থনিবাসটা দোতলা আর বেশ বড়োসড়ো। হলুদ রঙের নতুন বাড়ি। সামনে কোনো আড়াল নেই। একদম ফাঁকা। বালুভরা মাঠ। মাঠের নিচেই সমুদ্রের নীল। ঢেউ শাদা হয়ে ভেঙে পড়ছে বালু-বীচে। ইতিমধ্যে জল ঘাঁটতে, চান করতে নেমে গেছে একদল। একদম দেরী করতে চায় না যেন কেউ। সকাল দুপুর বিকেলে ঝাঁপাই জোড়া। সুমুদ্দুরের ধার ছেড়ে কেউ আর ঘরেই ঢুকতে চায় না। পান্থনিবাসের দোতলায় থাকার জায়গা পেলো ডিণ্ডিরা। সামনে টানা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালেই সামনে সুমুদ্দুর। কোন বাড়ীর আড়াল আবডাল নেই। ডিণ্ডি ভাবে, বারান্দায় কোমর পর্যন্ত দেয়াল তোলার বদলে যদি জালি-কাটা রেলিং থাকতো, তাহলে কী সুন্দর বসে বসে সমুদ্র দেখা যেতো! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হতো না।

॥ তিন ॥

লোবো আঙ্কলের আসল বাড়ির মুখটা ছিলো সমূদ্রের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। ওরা থাকতো ওখানে। আঙ্কল লোবো আর আন্টি লোবো। সামনে ছোট এক টুকরো উঠোন। উঠোনে, দেওয়ালের পাশে দুটো পেঁপে গাছ। পেঁপে গাছে পেঁপে। আর কিছু নেই। আছে পেঁপে গাছের গায়ে চুন। হাত দিলেই উঠে আসে।

উঠোনটার উল্টোদিকে পরের পর ঘর। ঘরের দাবা! ওগুলো রান্নাবাড়ির জন্যে। একটা, কোণের দিকে যেটা, সেটা গুদোম। কাঠকুটো, ঘুঁটে-কয়লা থাকে। একটু স্যাবি। চালে খাপড়া। দাবাটাও মাটির। ডিণ্ডি ওদিকপানে বিশেষ একটা যায় না। কিন্তু, যেতে হয়।

লোবো আঙ্কলদের ঘর তো ওটারই মুখোমুখি। ঘরের সামনে একটু বারান্দা মতন। মাথার ওপর কাঠের খেলাঘরের ছাউনি। ওপরে টালি। টালিতে সবুজ রং। তার ওপর ঝুমকো না কি যেন নামের লতা! ঝুমকো নয়। ঝুমকো লতা ডিণ্ডি জানে। এটা বোধহয়

তবে রেললতা গোছের কিছু। সেরকম ফুলই ফুটে আছে বহুৎ। গন্ধ-বাতাস কিছু নেই। এমনি শোভা। দূর থেকে দেখলেই তবে শোভা, নয়তো নয়। ভেতর থেকে তো আর দেখতে পাওয়া যায় না!

ডিণ্ডিদের ঘর দুটো সমুদ্রের দিকে মুখ করে। বারান্দায় বসে যেদিকে তাকাও সেদিকেই নীল জল, নৌকো, পাখি আর শাদা মেঘের ফুলে-ফুলে ভর্তি আকাশ। দুধ কেটে গেলে যেমনটা হয়, ঠিক তেমনি। হাওয়া দিলে জল এসে দেয়াল ভিজোয়। বারান্দা ভিজোয়। বেশ লাগে। ডিণ্ডির বেশ লাগে। বোধহয়, অন্যদের লাগে না। বাবাকে খাতা-কলম কুড়িয়ে উঠে পড়তে ছ্যাখে। মাকে ছ্যাখে পশমের সুতো লোটাতে-লোটাতে, বল তুলে ফেলে ঘরে ঢুকতে। একে কি আর ভালো লাগা বলে? তাহলে তো বণ্ডেলের গলিতে থাকলেই হতো। এতো কষ্ট করে, পয়সাপাতি খরচ করে এ্যাদ্দূর আসা কেন বাপু? আবার বলা হয়, আমার পাহাড় থেকে সমুদ্র ভালো লাগে! তা, এই কি ভালো লাগার ছিরি? তবু ভালো, ডিণ্ডিকে কেউ ঘরে আসতে বলে না। বলে না, এই ডিণ্ডি, বেলা দুপুর হলো, একটু গড়িয়ে নে। একটু ঘুমো। দুপুর বেলায় ভোঁসভোঁসিয়ে ঘুম ডিণ্ডির দুচক্ষের বিষ। বাইরে বেড়াতে এসে আবার টিকটিক করা কীরে? খুব খারাপ খুব খারাপ।

তা, ডিণ্ডির মা-বাবার স্বভাব অমনটা নয়। বরং, উলটোই। বসে থাকলে, বলে, এই বুড়ি, একটু ঘুরে-দৌড়ে আয়। ঐভাবে বসে থাকলে বয়েসটাও বসে থাকে, জানিস না? যাঃ পালা। অমনি দৌড়। কোথায় আর যাবে? সদর দিয়ে বেরোলেই রাস্তার অন্দর। যে-রাস্তা গিয়ে সোজা সমুদ্রের বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, সামনেই সেই রাস্তা। দেয়ালের ছায়ায় ছড়িয়ে বসে জাল বুনে চলেছে ডিণ্ডির জনদাদা, যে ওকে রোজ চান করায়। পিঠে করে নিয়ে যায় সমুদ্রের মধ্যে, অনেকটা।

ডিণ্ডির বাবা বহুবারই গোপালপুরে এসেছে। তাঁর কাছে কতো রকম গল্প শোনে সে। এর আগেরবার যখন মা-বাবা এসেছিলো, তখনো

ডিঙ্গি তার মার কোলে আসেনি। সুমুদ্দুরের ধার থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একটা বাড়ি ভাড়া করে সেবার ওরা ছিলো। ওরা মানে, অনেকে মিলে। একটা তিনঘরা বাড়ি ভর্তি করে। তখন ঠিক পুজোর সময়। একটা বিরাট বাগান-অলা বাড়ির পাশেই এই ছোট চুনকাম না-করা বাড়ি। অনেকগুলো জানালা নেই। বসানোই হয়নি। বড় বাড়িটায় চারচারটা ইয়াবড় এ্যালসেশিয়ান। তাদের পাশে ছোট্ট পুড্‌ল। বাড়িটাও তেমনি। বড়র পাশে ছোট পুড্‌লের মতন। বাবার তুই বন্ধুও এসেছিল। একজন ছবি-আঁকিয়ে, অন্যজন কাপড়-কলের ইনজিনিয়র। ওরা তুজন গিয়ে উঠেছিলো সুমুদ্দুরের কোলে এ্যাঙ্কোরেজ বলে একটা হোটেলে। ছবি-আঁকিয়ে বন্ধু ছবি বানানোর জন্যে জলের ধার বেছে নিয়েছিলো। ওখানেই সুবিধে। বসতির ভেতরে ছবির সাবজেকট বলতে কী খুঁজে পাবে? সেই কুকুরটার অনেক ছবি, ডিঙ্গি একটু বড়ো হয়ে দেখেছে। দেখেছে মিলিয়ে-মিলিয়ে। নীলজল—নৌকো—জাল আর থরে থরে রূপোলি মাছ। নীল জলের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সীগাল উড়ে যাচ্ছে দূরে কোথায়।

ছবি-আঁকিয়ে কাকুর সেই হোটেলের আজ আর কিছু নেই। সমুদ্র খেয়েছে। নীলজল দৌড়ে আসছে লোবো আঙ্কলদের বাড়িটার প্রায় পা পর্যন্ত। আজ এখন।

সেবার মা-বাবারা বেশিদিন থাকেনি। কী যেন একটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো চিলকা হ্রদের ধারে। রম্ভায় ছিলো ওরা। সেখান থেকে পুরী। পুরী থেকে ফিরে কলকাতায়।

থাক সেবারের কথা। শোনা কথা। ভুলে-ভালে যাবার কথা। এবারের কথা হোক।

জাহাজকে আলো দেখানোর জন্যে মনুমেন্ট কছমের একটা মিনার পাতা আছে, ঠিক লোবো আঙ্কলদের হোটেল বাড়িটার পেছনে। তার চারদিকে জেলখানার মতন উঁচু পাঁচিল। গেটে দরোয়ান। সবার ঢোকা বারণ। ঐ আকাশপিদ্দিমটা দেখাশোনার কত্তা হলেন গিয়ে

ডিঙির আঙ্কল লোবোর বন্ধু। একদিন বিকেলবেলা সবাই মিলে তাঁর বাড়ি। ইচ্ছে, তিনি হ্যাঁ করলে ঐ চুড়োয় উঠে চতুর্দিক দেখা। ওঠার নিয়ম-ফিয়ম নেই। বিশেষ করে বাচ্চাদের। তাও তিনি বললেন, খুব সাবধানে উঠবে এবং এই যে উঠতে পেলে এ-ব্যাপারে কারুকে কিছু বলবে-কইবে না।

ঘোরানো সরু সিঁড়ি বেয়ে ক তলা কে জানে, উঠতে লাগলাম। ওঠা আর শেষ হয় না। উঠছি তো উঠছিই। পা টনটন করছে। উঠছি। উঠে চলেছি। মা-বাবা আমি আর সেই রাঙা কাকিমা কাকু, যারা কিনা আমাদের পাশের ঘরে আছে, তারা। লোবো আঙ্কল বহুবার উঠেছে। তাই এবার আর উঠলো না। বললো, আমি ডিঙি বেটির জন্যে গান বাঁধছি পিয়ানোয়। বেঁধে ফেলি। তোমরা ঘুরে এসে শুনবে।

অন্ধকার গুঁড়ি মেরে আসছে সুমুদ্দুরের ওপার থেকে। জঙ্গলের ধার থেকে। ওদিকে সব কাজু বাদামের বন। মাইলের পর মাইল জমা নিয়ে কে যেন চাষ করেছে।

কন্টিকার ঝোপ-কাঁটার জন্যে ভয়। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে জুতো খুলে রাখাই সুবিধে। আমরা জুতো খুলে বকের মতন পা তুলে-ফেলে এগিয়ে চলেছি ঐ গম্বুজটার দিকে।

বালি ঠাণ্ডা। খালি পায়ে ঠাণ্ডা বালি লেগে গা উঠছে কনকনিয়ে, কেঁপে। মাথার ভেতরটা ঠাণ্ডা শীতল হয়ে আসছে।

সরু, একজন ওঠার সিঁড়ি। বাঁহাতি ঝকমকে এ্যালুমিনিয়ম-রড। সেটা সাপ্‌টে ধরে ক্রমাগত ওপরে। লোবো আঙ্কলের পিয়ানোর বাজনা সুমুদ্দুরের শব্দের সঙ্গে মিলে সে যে কী আহামরি একটা আওয়াজ কানে আসছে। তুলনা হয় না। ওপরে গোল বারান্দা ঘিরে লোহার রেলিং। রোদ্দুর লেগে ঝকমক করছে। ধারে যাওয়া নয়। ধারে গেলেই বুক দুরদুর। পিঠে গম্বুজের গা চেপে বসে গেলাম। সব কিছু খেলনা-খেলনা কেমন। ছোটমোটো। সুমুদ্দুর শুধু বহুদূর পর্যন্ত তার নীল গা খুলে রেখে শুয়ে আছে।

সাধু দেবকুমারের আজব কাহিনী

মহাসাধু দেবকুমার তখনও সাধুসন্ত কোনওটাই নন। কিছুদিন হল বিয়েশাদি সেরে নববধূসহ মধুযামিনী করতে বেরিয়েছেন। চাকরি-বাকরি কিছুই করেন না। দাদাবৌদির হোটেলে সবলে আছেন। সবলে কথাটার পিছনে কিছু বলবান উপাখ্যান আছে।

তিরিশের মধ্যে বয়েস। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা। পেশীপুষ্ট। পরোপকারী যুবা। যে-কোনও ঝামেলায় মহড়া নিতে সদা আগুয়ান। আখড়ায় ফি-দিন কুস্তি লড়েন। ছোরাখেলা, লাঠিখেলা—সবেতেই নং ১। এমনকি কয়েকবার মহাপরাক্রমশালী দারা সিংকেও চিত করেছেন। জুনিয়র বকসিং-এ পর পর দু বছর চ্যাম্পিয়নও ছিলেন। তবে, এগুলোর মধ্যে তো আর দোষের কিছু ছিল না। দোষ একটিই। তা হল, প্রতিদিন এক-আধটি ঘটনা বাধানো। আর সে ঘটনাগুলির নায়ক স্বয়ং দেবকুমার। এক ঘুষিতে কারো চোয়াল খুলে গেল, কারো বা একপাটি দাঁত খসে পড়ল টগর ফুলের মতো। প্রত্যেকটা খবর কানে আসত আর দাদা বেধড়ক পিটতেন। দেবকুমার মাথা নিচু করে জানাতেন, লোকটা খারাপ বা ওরা এককাট্টা হয়ে বুড়ো পুরুত-মশাইকে শেষ করে দিচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়ে···

কথা শেষ হয় না। খিলের বাড়ি পিঠে আরো উপর্যুপরি নেমে আসে। দেশের ভাল করার দায়িত্ব তোমায় কে দিয়েছে? সমাজ-শাসক! কে আমার রবিনহুড এলেন!

এভাবেই বছরের পর বছর তিতিবিরক্ত হতে-হতে দাদাবৌদি দেব-কুমারের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। ভাবলেন, বদল হবে। হলও

তাই। ওঁদের প্রেস্ক্রিপশন সমূহ কার্যকর হল। এছাড়াও হাতে কিছু থোক টাকা দিয়ে বললেন, যে-কোনও একটা ব্যবসা করো। খাবে বাড়িতেই। তবে, তোমার হাতখরচ আজ থেকে বন্ধ। মাসে দুজনের টুকিটাকি খরচ চালিয়ে নিতে হবে। আমি দিতে পারি, কিন্তু দেব না। স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করো। বয়েস হয়েছে।

পিতৃতুল্য দাদার কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিলেন দেবকুমার। কলেজ স্ট্রীটে একটা বই-এর দোকান করলেন। মূলধন ছাড়াও অন্যতম প্রধান সম্পদ ছিল সততা। দিনে-দিনে একটা চলনসই জীবন কাটাবার ব্যবস্থা হল। দেবকুমার সদাস্মুখী, নিয়তপ্রফুল্ল। বউকেও তেমন করে গড়ে নিলেন।

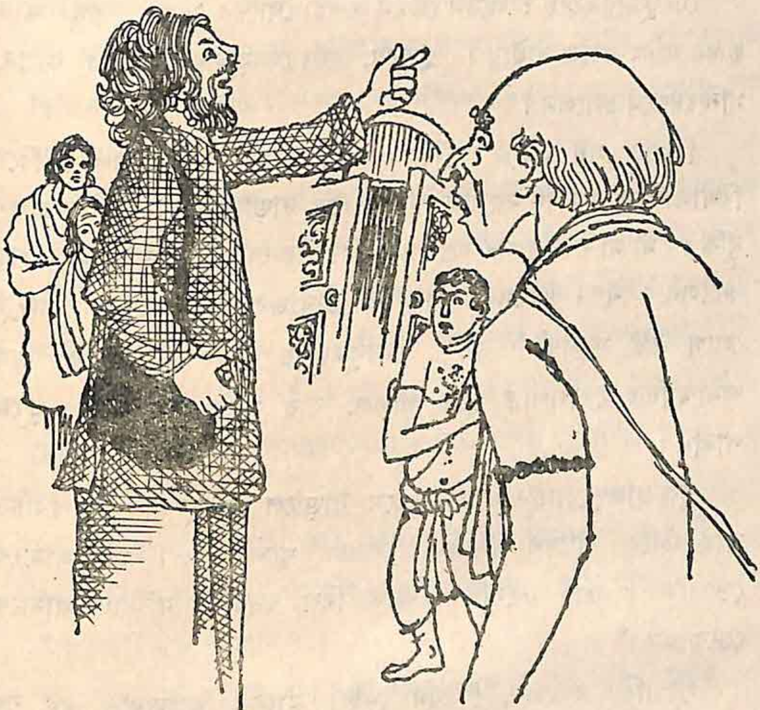
কিন্তু আমাদের গপ্‌পো এহেন দেবকুমারের সাধু হওয়া নিয়ে।

ঘুরে বেড়িয়ে, ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেবকুমার ও দেবকুমারীর দিন কেটে যাচ্ছিল। খুব-একটা তেল-তেল ফুল-ফুল দিন না কাটলেও, কেটে যাচ্ছিল।

দেবকুমারের তখন মাথাভর্তি জটা। একগাল কাপালিক-দাড়ি। পরনে গেরুয়া রঙে ছোপানো কুর্তা আর লুঙ্গি। পায়ে খড়ম। হাতে একটা বেলকাঠের সাদাটে লাঠি। পাহাড়-টিলায় ওঠার জন্যে। কমণ্ডলু নেই। সাধু তো আর নন!

দেবকুমারীকে গৌহাটিতে এক বন্ধুর বাড়ি রেখে আগরতলায় এসেছেন। উঠেছেনও এক বন্ধুর বাড়ি। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বাসে-ট্রাকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন জলে-জঙ্গলে। মনের আনন্দে। সেই বন্ধুর জিপে চড়ে গোটা এলাকা তোলপাড় করে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু সেই গেরুয়া রং, সেই জটাজুট তাঁকে ইতিমধ্যেই দ্রষ্টব্য করে তুলেছিল। খুবই স্বাভাবিক। কেউ ভাবছিল, তিনি সন্ন্যাসী। কেউ ভাবছিল মঠমন্দিরের সন্ত। কেউ বা ভাবছিল কোনও বিশেষ সংঘপ্রতিষ্ঠানের বাবাজী। গুরুঠাকুর। কিন্তু, তেমন কেউ তখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে ঘেঁষেনি।



শুধু একটি ঘটনা, তাঁকে একদিনে মোহন্ত সাধু বানিয়ে দিল। সে-গপ্পেই আসছি।

তেমন কোনও কথা ছিল না, হঠাৎই দেবকুমার ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন। তখন ভরদুপুর। রোদ্দুরে চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। পায়ে সেই খড়ম, তেমনি গেরুয়া পরনে। হাতে লাঠিটি শুধু নেই! কাঁধে এক আজানুলম্বিত কাঁধ-ব্যাগ।

দেবকুমার হেঁটে চলেছেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে। বন্ধু আজ দুদিন যাবৎ কাজে বাইরে। সুতরাং, একা দেবকুমার কী আর করেন, মন্দিরদর্শনে চললেন।

বিশাল সেই রাজার মন্দির। বহু পুরনো। চণ্ডীমণ্ডপ পেরিয়ে বিশালাকার এক বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভ্রূকুটি করলেন বুঝি। মা মা করে দুবার বজ্রকণ্ঠ ধ্বনির পর হাঁটু মুড়ে বসলেন। গড় করলেন। যখন উঠলেন, তাঁর দুই চোখ জবালাল। হয়তো রোদ্দুর লেগে এই রক্তাভা। কিন্তু, দেবকুমারের মনের ভিতর কী এক অনাস্বাদিত তোলপাড় হতে থাকল, যার মানে তিনি কখনও খুঁজে পাননি।

বৃদ্ধ রাজপুরোহিত সামনে এসে দাঁড়ালে দেবকুমার এক বিচিত্র স্বরে তাঁকে আদেশ দিলেন, "দরজা খুলে দাও। মা আমাকে ডেকেছেন। তাই এসেছি। আজ বিশ বছর বাদে মা আমাকে ডেকেছেন।"

পুরোহিত বললেন, "নিয়ম নেই। রাজার আদেশেও এই বন্ধ দরজা এখন আর খুলবে না। অসম্ভব।"

সেই লোহার বল্টু লাগানো বিশাল দারুদরজার দিকে মুখ করে দেবকুমার বসেই রইলেন। ঠিক কতক্ষণ ছিলেন, খেয়াল নেই।

ইতিমধ্যে মন্দিরচত্বরে যে দু-চারজন ছিলেন, কৌতূহলবশবর্তী কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। দেবকুমারের কোনোদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি চোখ মুদে মার উদ্দেশে ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন,

তোর ডাক শুনে এলাম আর তুই দরজা বন্ধ করে নিদ্রা যাচ্ছিস! এ কেমন ব্যবহার মা? ছেলের প্রতি এ কী মায়ের ব্যবহার! ঠিক আছে, আমি ফিরে যাচ্ছি। বহু বছর বাদে তোর ডাকে ফিরে এসেছিলাম। ফিরেই যাচ্ছি। আর কোনও দিন দেখা হবে না। যেমন ত্যাজ্যপুত্র ছিলাম, তেমনই ত্যাজ্য হয়ে ফিরে চললাম।

"সে যে কী ঘোর লেগেছিল, আজ অবধি তার কোনও ব্যাখ্যা পাইনি। সে কি গেরুয়ার ঘোর! জানি না।"

স্বাভাবিক দেবকুমার সেদিনের সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা বলতে-বলতে শিউরে ওঠেন। দুটি হাত সামনে বাড়িয়ে দেখান কেমন রোম খাড়া হয়ে উঠেছে!

"তারপর বড় বড় লোহার দুটো তালার ফাঁকে দু লাইন খসখস করে 'মা কি এমন ব্যবহার করতে পারে ছেলের প্রতি? চললাম'—লিখে দুটো তালার ফাঁকে চিরকুটটা গুঁজে দিলুম। দিয়েই পিছন ফিরেছি—অমনি ঐ দুই ভারী দরজা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে খুলে গেল।

"সেই ফাঁকা দরজা দিয়ে মন্দিরস্থ ভয়ংকর কালোর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে ফেললাম। প্রচণ্ড ভয় করতে লাগল। এ কী হল? এমন তো চাইনি!

"আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ-পূজারী আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল। 'আমার অন্যায় হয়েছে, ঘাট হয়েছে। আমি তোমায় চিনতে পারিনি বাবা।'

"উনি তো সাষ্টাঙ্গ, ওঁর সঙ্গে আশেপাশে যারাই ছিল, সবাই পায়ে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এর এই প্রার্থনা, ওর ওই—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। প্রত্যেককে বরাভয় দিয়ে, যেভাবে এসেছিলাম, তার চেয়ে অন্যভাবে পালিয়ে বাঁচলাম।

"কিন্তু, বাঁচা কি যায়? তখন তো ধরা পড়ে গেছি। প্রায় সবাই পিছু নিয়েছে। আলৌকিক এক বাবার কথা গোটা শহরে রটে গেছে আগুনের মতো। আমার ঐ বন্ধুর বাড়ি তখন বাবার আশ্রম। লাইন

করে সবাই বিপদভঞ্জন বাবার সামনে।

"আর আমারও মুখ দিয়ে অমোঘ সমাধান বেরিয়ে আসছে। কী বলছি কোনও খেয়াল নেই।

"এই করে দুদিন কাটলে, আমার বন্ধু সপরিবার এসে যখন গভীর রাতে আমার সামনে করজোড়ে বসল, আমার চেতনা ফিরল।

"বললুম, 'গোপেন্দু কাল ভোরের ফ্লাইটেই যাবার ব্যবস্থা করো। নইলে তোমারও বাস উঠবে এখান থেকে এবং আমারও গায়ের চামড়া গায়ে থাকবে না। ভক্তেরা চামড়া খুলে নেবে।"

আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি, 'ব্যাপারটা হল কী করে? অবিশ্বাস্য!"

দেবকুমার ভাসতে-ভাসতে কুটো ধরার মতো বললেন, "মনে হয় ঠিকমতো তালা লাগান হয়নি। তালার ফাঁকে চিরকুট ঢোকাতে গিয়ে দরজায় চাপ পড়ে থাকবে।

"ভোরবেলা জন্মের মতো গেরুয়া ছেড়ে প্লেনে উঠলাম।"

হাতি-ধরিয়ে নায়ার

পালখোড়ের ছেলে নায়ারের জন্ম যেন হাতি ধরার জন্যেই। নতুন কিছু নয়। নানা হাতি ধরত। সেবা-যত্ন করত নানি। বাপ-চাচা ধরত। মা-চাচি তার মুখে তুলে দিত খাবার। ভুষি, গুড়, থোড়, ঘাস এইসব। হাতি হত তাদের পালিত্। রাজা-রাজড়াদের আমল থেকেই কেরালার তেকড়ি, উমাডি, কাছিতোড, বার্লিয়ার, পারচেকুডম প্রভৃতি জঙ্গল থেকে হাতি ধরা হত। তখনকার দিনে জঙ্গলে হাতির কোনও গোনাগুনতি ছিল না। রাজকাজে ছাড়াও, পরবর্তী সরকারের কম্মে লাগার পর, লকড়ি টানার কাজে হাতিই ছিল এক এবং অদ্বিতীয়। আজও আসাম ও উত্তর বাংলায় এই হাতিই জঙ্গল থেকে কাঠ রেল-ওয়াগনে ভরে দেয়, লরি ভরাট করে। দক্ষিণী হাতি সারকাসেও বড় কম নেই।

নায়ারের পুরো নাম কে কুট্টন নায়ার। বয়েস ৫৪। মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় ওয়াইলড লাইফ স্যাংকচুয়ারির হাতি-ট্রেনার। পাঁচ-পাঁচটি হাতি এখন তার হেপাজতে। দাঁতাল গোধনই দলের একমাত্র পুরুষ। বাকি চারজন—লতা, কল্যাণী, তারামতি আর তুফান মাদা। লতার বয়েস ৪০, কল্যাণীর ৫০। বাকি দুই, গোধনসুদ্ধ, ১৮-১৯।

বারলিয়ার জঙ্গল থেকে ধরা পাঁচ-পাঁচটি হাতি মধ্যপ্রদেশ সরকার কেরল থেকে কিনলেন। হোসেঙ্গাবাদে কাঠ বওয়ার কাজ তাদের। সেই তাদের সঙ্গেই দেশ ছাড়ল নায়ার। আর দেশে ফেরেনি। হোসেঙ্গাবাদ থেকে কানহায়। মাহুত নায়ার হাতি চড়িয়ে কানহার জঙ্গলে শের দেখিয়ে বেড়ায় ট্যুরিস্টদের। সেখান থেকে বান্ধবগড়ে এই

বছর-চারেক।

এদিককার সমস্ত অভয়ারণ্যই ১ নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খোলার কথা। আমরা দিন-তিনেক আগে পৌঁছে বনপাল ভজিয়ে উমারিয়া থেকে বান্ধবগড়ে এসে পড়েছি। দখল নিয়েছি বাংলোর। কাঁচা সবজি আর চাল ডাল নুন বয়ে এনেছি। লকড়ির তো অভাবই নেই। চমৎকার চার-ঘরা কাঠের বাংলো। মাঝে ড্রইং-ডাইনিং। প্রধানত আমলকী বনের মাঝখানেই আমাদের বসবাস। অ্যাসবেসটসের ছাদ ভরা মুন ফ্লাওয়ার। সামনে করমচা ঝোপ। মরামের রাঙা পথ দিগ্‌বিদিকে বেরিয়ে গেছে। কাক্করের ডাকে ঘোর কাটে। একটা ঝিম-ধরানো ভাব সর্বত্র। সেই ভাবের কাঁথা সেলাই করে উড়নচণ্ডি ঝিঁঝি।

হাতে আমাদের একটা ভাড়া-করা সাদা অ্যামবাসাডার। জব্বলপুর থেকে আজ দিন-দশেক হল ট্যাঙশ-ট্যাঙশ করে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মারবেল-সফেদ গাড়ি। জঙ্গল কিন্তু এসব গাড়ির কদর করে না। তার চাই জিপ-জোঙ্গা। পাব কোথায়? এখনও সীজন শুরু হয়নি। গাড়িঘোড়া হুজুরে হাজির নয়। হাওদায় রং পড়ছে। বাথরুমে গিজার আঁটা হচ্ছে। কটগুলো হচ্ছে রং-এ রং-এ রঙিন। দেয়ালে নতুন ডিসটেম্পার। জঙ্গলে একটা সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে।

দুপুরের খাওয়া সারা। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। নায়ার পুরনো হাওদা গোধনের পিঠে চাপিয়ে ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে। আমরা তড়িঘড়ি তৈরি। বাংলোর পেছন দিকে গোধন আমাদের নিয়ে জঙ্গলে।

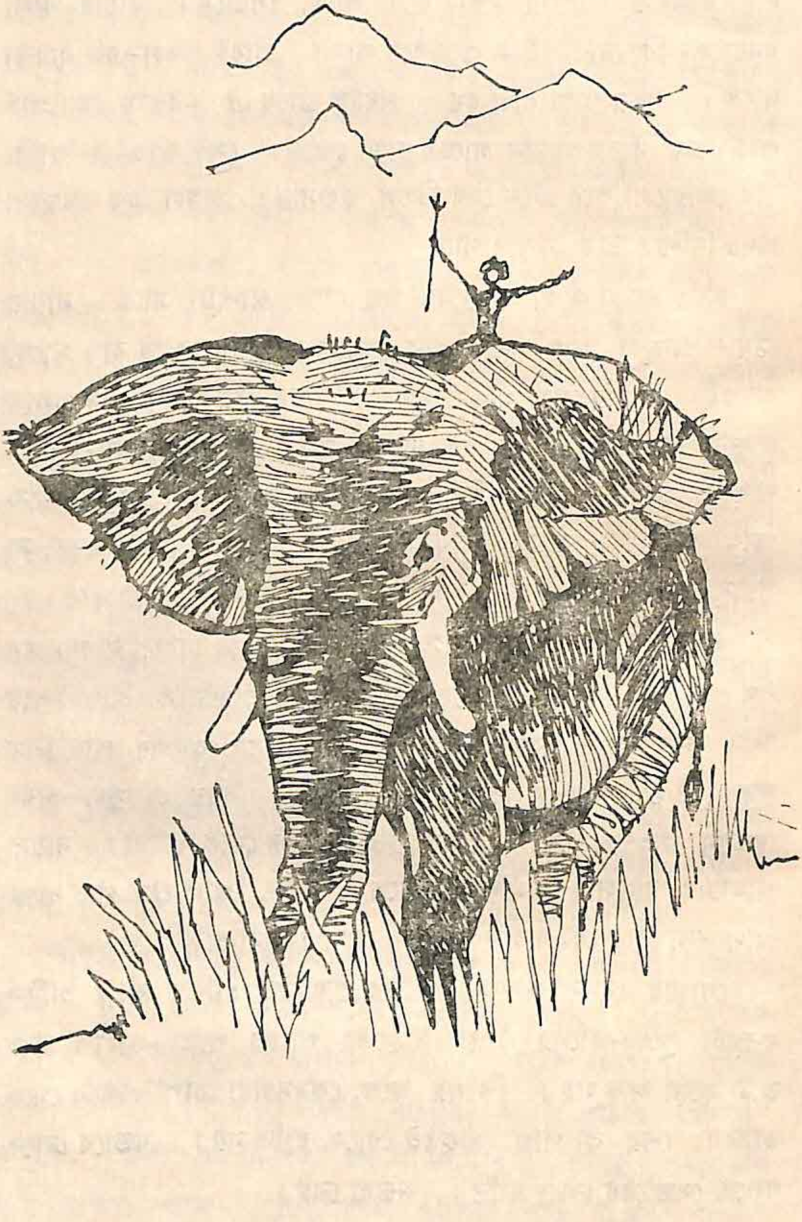
আকাশের কোণে হালকা ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ। নায়ারের বাঁহাতে ডাঙশের বদলে একটা টাঙিকছমের জিনিস। পড়লুম গিয়ে ঘাসের সমুদ্রে। কোমর-উঁচু বাঘ-ঘাসের ভেতর দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল গোধন। ঘাস খুঁড়ে চলেছে নায়ারের সতর্ক দুচোখ—এদিকে-ওদিকে। বলল, এই ঘাসবনই হল আসল টাইগার-কভার। বাঘ এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সুযোগমতো ঝাঁপিয়ে পড়ে হরিণের ওপর।

হরিণ ছাড়া, বাগে পেলে বুনো শুয়োর। বাচ্চা মোষ বা বাছুরের মাথা এখানে-ওখানে। ইতস্তত হাড়—বিশেষ করে ঘাসের বিছানা যেখানে দড়ি-দোলনার খোলের মতন হয়ে আছে, সেখানে। নায়ার বলে, বনরাজের বিছানা। উনি শুয়ে-বসে খান। প্রায়ই 'কিল'-এর ব্যবস্থা থাকে। বাছুর মোষ বাঁধা হয়। পর্যটক ছাখে ঐ অবস্থায় 'অ্যালার্ম কল' দেয় বাঁদর-হনুমান গাছের চুড়ো থেকে। সেই আওয়াজ আরো দীর্ঘ জোরালো করে টেনে দেয় চিতল, কৃষ্ণসার। জঙ্গল এক অজানা অথচ নিশ্চিত ভয়ে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ একটা ঝাঁঝালো গুমোট গন্ধ নাকে ঝাপ্‌টা মারে। নায়ার ঠোঁটে আঙুল তুলে সতর্ক করে আমাদের। কাছাকাছি বাঘ আছে, আছেই। নায়ার তার গোধনকে খুব হুঁশিয়ার করে দেয়। কেঁদ পলাশ বয়ড়ার ঝোপের মধ্যে পর-পর চারটে চিতল। পথে যেখানে পাতা পড়েনি, সেখানে মাটি-বালির ওপর বাঘের পায়ের ছাপ বা পাগ-মার্ক দেখে বুঝে নেয় নায়ার, বাঘ কোন্‌দিকে গেছে। মার্ক নতুন, না পুরনো—তাও বুঝে নেয়। আর সেইমতো গোধনকে চালনা করে।

প্রকৃত কোনও পথ নেই জঙ্গলে। বিশেষ করে হাতির জন্যে। সে পথ করে নেয়। নির্দেশ পেলে একটা ষাট-সত্তর ফুট কেঁদ গাছ উলটে দিতে দু-সেকেণ্ড। বাঁশ আমলকী বুনো কুলের ঝোপের পাশ দিয়ে জঙ্গল ঠেঙিয়ে বেড়াল গোধন ঘণ্টা-দুয়েক। সম্বর দেখলুম, হরিণ দেখলুম কতশত, শেরের দেখা নেই। শের মেলে ভাগ্যে। নায়ার আমাদের বাংলোয় নামাল সন্ধে-সন্ধে। বলল, "কাল সুবে পাঁচ বাজে আপলোগ রেডি হো যাইয়ে। শের জরুর মিলনা চাই।"

ঘোড়ার যেমন লাগাম, গাড়ির স্টীয়ারিং, হাতির কী? হাতির দু-দুটো কুলো-কানের ওপরে মাহুতের পায়ের পাতা। কাজ করে দুটো বুড়ো আঙুলই। কিসের জন্যে, কেমনধারা চাপ—জেনে গেছে হাতি। শের কী পাঞ্জা মাহুতই বোঝে, হাতি নয়। যেভাবে চলতে বলবে, সেভাবেই চলবে হাতি। অন্যথা নেই।



"বয়েস কীভাবে বোঝো ?" নায়ারকে জিজ্ঞেস করি।

"কান দিয়ে। বয়েস যত বাড়ে, কুলোকান তত মুড়তে থাকে। এছাড়াও, পাঞ্জার বেড় দিয়েও বয়েস আঁচ করা যায় "

"মোটামুটি বাঁচে কতদিন ?"

"একশো-বিশ তো হোবেই। জ্যায়দা ভি হো সক্তা।"

নায়ারের বউ কল্যাণাম্মা। হাতির খাওয়া-দাওয়া সমস্ত তারই হাতে। এক নাতিন আছে ঘরে। সেও নানির সঙ্গে হাতির সেবা-যতন করে। কল্যাণাম্মা খেতে না দিলে সেদিন সবার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। ৩৪ বছর স্বামীর সঙ্গে এই একই কাজ সে করে যাচ্ছে। খাবার ব্যাপারটাও বড় আশ্চর্যের। ধরো, দশ কিলো চালের ভাত খায় রোজ। তুমি একদিন পরীক্ষা করার জন্যে এগারো কিলো চাল নিলে। ভাত করলে। খেতে দিলে। ঠিক কিলোটাক ভাত বালতিতে পড়ে থাকবে। তোমার আমার মতন না, দু পদের বদলে দশটা পদ হলে কণ্ঠা পর্যন্ত খেয়ে নিলুম। তারপর কুমড়ো-গড়ান।

আরও একটা অদ্ভুত কথা বলল নায়ার। ধরো, তুমি চা-দোকানের সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে চা খেতে দোকানে ঢুকলে। গোঁসা হবে। অথচ, হাতির ওপরে বসে খাও। কিচ্ছু মনে করবে না। ওর মান-অপমানবোধ অত্যন্ত কড়া। ভালবাসা, মাহুতের জন্যে, পুরোটাই জমা থাকে। খরচ হয় না।

নায়ার মাইনে পায় আড়াইশো টাকা। বললুম, "ধরো যদি তুমি অনেক টাকা মাইনের একটা চাকরি পাও, হয়তো শহর-বাজারে। তুমি যাবে ?"

"কভি না, বাবু। মরেঙ্গে, তব ভি এ-কাম নেই ছোড়েঙ্গে।" কেরলের জিভ হিন্দি নাড়াচাড়া করতে করতে উত্তর দিল। চাকরি শেষ হলে, করবেটা কী ? "দেশ যাব। জঙ্গলে ঘুরব-ফিরব। হাতি ধরব। সরকারকে দিব। না ধরতে দিলে, হাতি ট্রেন করব, সরকারে-বেসরকারে। লগ টানা কাজে হাতির এখনও বহুত কদর, বাবু।"

তিতিরের নাম টুনটি

শেষ মোরগের লড়াই দেখেছিলুম মেটেলি-চালসার হাটে। চারদিকে চা-বাগান। জাব্‌ড়া সবুজের কাজ-কারিগরির মাঝখানটায় মালভূমির মতন ঈষৎ উঁচু গোলগাল হাট। হপ্তায় দুবার বসে। শনি-মংলায়। খদ্দের বাগানের কুলিকামিন। দোকানদার বিহারি-মাড়োয়ারি। এখানেও কাবলিঅলা। দূরে গাছের শিকড়ে কবির মতন উদাসীন বসে রয়েছে।

তারপর, এই মধ্যপ্রদেশের জলে-জঙ্গলে ঘুরতে-ঘুরতে দেখলুম লড়াকু তিতির। লামনি আচানকমার জঙ্গলে আর দু-দুটো বাংলোয় দু'রাত কাটিয়ে ফিরে চলেছি বিলাসপুর। সেখান থেকে যাব বান্ধবগড় সাদা বাঘের জঙ্গলে।

পড়ন্ত বিকেল। আমরা একটা তেমাথায় গাড়ি থামিয়ে চায়ের ঝুপড়িতে। গাড়িটাকেও ঠাণ্ডা করার দরকার। তরতাজা রাখা দরকার আমাদের 'পাইলট'-কেও। ঘসিরাম চা খেতে শুরু করলে পরপর দু-তিন কাপ খেয়ে ফেলে। কুছ পরোয়া নেই। চা খাবার পরে ওর হাতে সাদা অ্যামবাসাডর যেন টাট্টু-টগবগে।

চতুর্দিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। ঠিক যেখানটায় বসে রয়েছি সেখান থেকে, তিন-তিনটে রাঙা ফিতের পথ তিন দিকে। মরামের রাস্তা। মরা বিকেলের আলোয় মারাত্মক দেখাচ্ছে। লাল-সবুজের সে একটা মারকুট্টে ছবি।

কাছে কোথাও হাট ভেঙেছে। হৈ হৈ রঙের শাড়ি পরে দলে দলে ছত্রিশগড়ি কামিন, মাথায় হাঁড়ি কলসি নিয়ে ঘরকুনো। হ্যাঁ, লাউটা নাজনেডাঁটার তাড়া হাঁড়ির মুখ দিয়ে উঁকি মারছে। হাঁটার ভঙ্গি



আর নাচের ভঙ্গির কোনও তফাত নেই। একটানা গান গাইতে-গাইতে, রঙিন পথ রাঙা করে ঘরের দিকে। সন্ধের আগেই পৌঁছুতে হবে। জঙ্গলে ওত পেতে আছে ভয়ংকর। সেজন্যেই হয়তো চলনে আঠা কেটে এসেছে গতি।

হঠাৎ নজরে পড়ল লোকটা। লাল নীল সবুজ তাপ্পি দেওয়া জামা। মালকোচাঁ-মারা ছাপানো ধুতি। কাঁধে একটা বেমক্কা তেলচকচকে লাঠি। এই লাল-সবুজের কোলাহলের মধ্যে বাঘের ডাকের মতন লোকটা তেমাথায়। ইয়া তাগড়াই গোঁফ গালপাট্টা। মাথায় পাগড়ি। মুখে ম্যাজিকঅলার রহস্যময় হাসি।

আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে বলল, "নমস্তে বাবুজি।"

প্রতিনমস্কার সেরে আমরা বললুম, "তোমার একটা ছবি নোব।"

"এক কাহে? একশো লিজিয়ে না।"

পাশে বসিয়ে চা খাইয়ে ওর কাছে যা শুনলুম, বলি। লোকটির নাম মগনলাল সিং। হ্যাঁ, ছত্রিশগড়িই। জাদু জানে। আর জানে তিত্তিরের লড়াই।

তিতির একটা কিনেছিল ও শোণপুরের মেলা থেকে। তা, সে হবে দশ সাল। হ্যাঁ, পাক্কা দশ সালই। নাম দিয়েছিল টুনটি। ছ কুড়ি টাকা গুনে দিতে হয়েছিল ঐ পাখিটার জন্য। তা, খেলা জানত বটে টুনটি। কত যে বাজি জিতেছিল পাখিটা। জড়িবুটি বেচার সঙ্গে সঙ্গে মদনলাল তার টুনটিকে দিয়ে লড়াই করাত।

জমিদার জোতদারের বাড়ির উঠোনে লড়াই লাগানো হত। বহু লোক বাজি ধরত। উৎসবের এটা একটা প্রধান অঙ্গ। বিশেষ করে দশেরার সময়, দেয়ালির সময় প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা বাজি ধরা হত। যারা যে-পাখিতে টাকা লাগিয়েছে, তারা জিতলে, পাখির মালিককে বেশ মোটা অঙ্ক দিত। আগে থেকে ঠিক করা হত, কত দেবে।

মদনলালের গর্ব ছিল টুনটি। আজ একদম পড়ে গেল। অন্য

আরেক লড়াক্কুর পায়ে-বাঁধা চকচকে ছুরির ফলা টুনটির বুকে বসে গেল। রক্তের ফিনিকে ভিজে গেল যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলো। ওই হাটেই টুনটি কতবার জিতেছে। বুড্ডা হয়ে গিয়েছিল পাখিটা। মদন বুঝতে পারেনি।

তাই, টুনটির খাঁচাটাও জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মদন।

"তোমার কষ্ট হচ্ছে না?"

"কষ্ট কী!" বলে গাল মেলে হাসার চেষ্টা করল। দেখলুম, চোখের কোণে চিকচিক করে উঠেছে জল। মুহূর্তের মধ্যে 'নমস্তে বাবুজি' বলে মদন হাঁটা দিল। অন্ধকার নামো-নামো করছে। এবার আমাদেরও যেতে হয়। নয়তো রাত হয়ে যাবে।

আহ্বানপুরের জঙ্গলে

রায়পুর থেকে বেরোতে বেরোতেই বেশ বেলা হয়ে গেল। এই তিনটে সাড়ে-তিনটে। আহ্বানপুর দূর বেশি নয়। কিন্তু, সন্ধের আগেই পৌঁছুনো দরকার। না পৌঁছুলে চৌকিদারকে ধরা যাবে না। ওকে না ধরতে পারলে দুমুঠো অন্নও জুটবে না।

কাপ্ কেটে ঠাণ্ডা পড়েছে। নভেম্বরের মাঝ-বরাবর। কালীপুজোও শেষ। বাজি-বাতির ওম্ ফুরিয়েছে। শহরে ফেরার আগে, আহ্বান-পুরে ঝাঁকিদর্শন সেরে নেবার ইচ্ছে। বিশেষ করে রায়পুর বন-আপিসের গায়ে লটকে-রাখা 'ভিজিট আহ্বানপুর স্যাঙ্কচুয়ারি' চোখের আড়াল হতে চাচ্ছে না। সেই বনছবির ফাঁক-ফোকরে বাঘ, হরিণ, চিতা অনবরত উঁকিঝুঁকি মারছে।

এবার নিয়ে চার চারবার মধ্যপ্রদেশে এলুম। দেশটার যেন শেষই নেই! মোট দেড়-দু মাস ঘুরেছি ভাগে ভাগে। দু-চারদিন ছাড়া ঠায় বসিনি কোথাও। এবারেও রায়পুরকে 'বুড়ি' সাব্যস্ত করে জঙ্গল বড় কম ঘুরলুম না। তোরেঙ্গে, কারলাপেট (উড়িশার কালাহান্ডি জেলা) এবং আরেক দফা কানহা-কিসলি। এবার পেছন থেকে আক্রমণ। মুককি হয়ে বামনিঘাট, কিসলি-কানহা। এমন ভয়ংকর মর্যাদাবান সেগুন জঙ্গল মধ্যপ্রদেশের আর কোথাও নেই। এমন বাঘ-হরিণের ছড়াছড়িও নেই কোথাও। বিদেশীদের কাছে কানহা একটা ক্রেজ। তিন-চার বছর পর্যন্ত কানহা-কিসলির সমস্ত ঘরের দরজা বন্ধ। বিদেশীরা আগেভাগেই সংরক্ষিত করে রেখেছে।

সুতরাং, আমাদের এই ছোটখাটো জঙ্গল অভয়ারণ্যই ভাল।

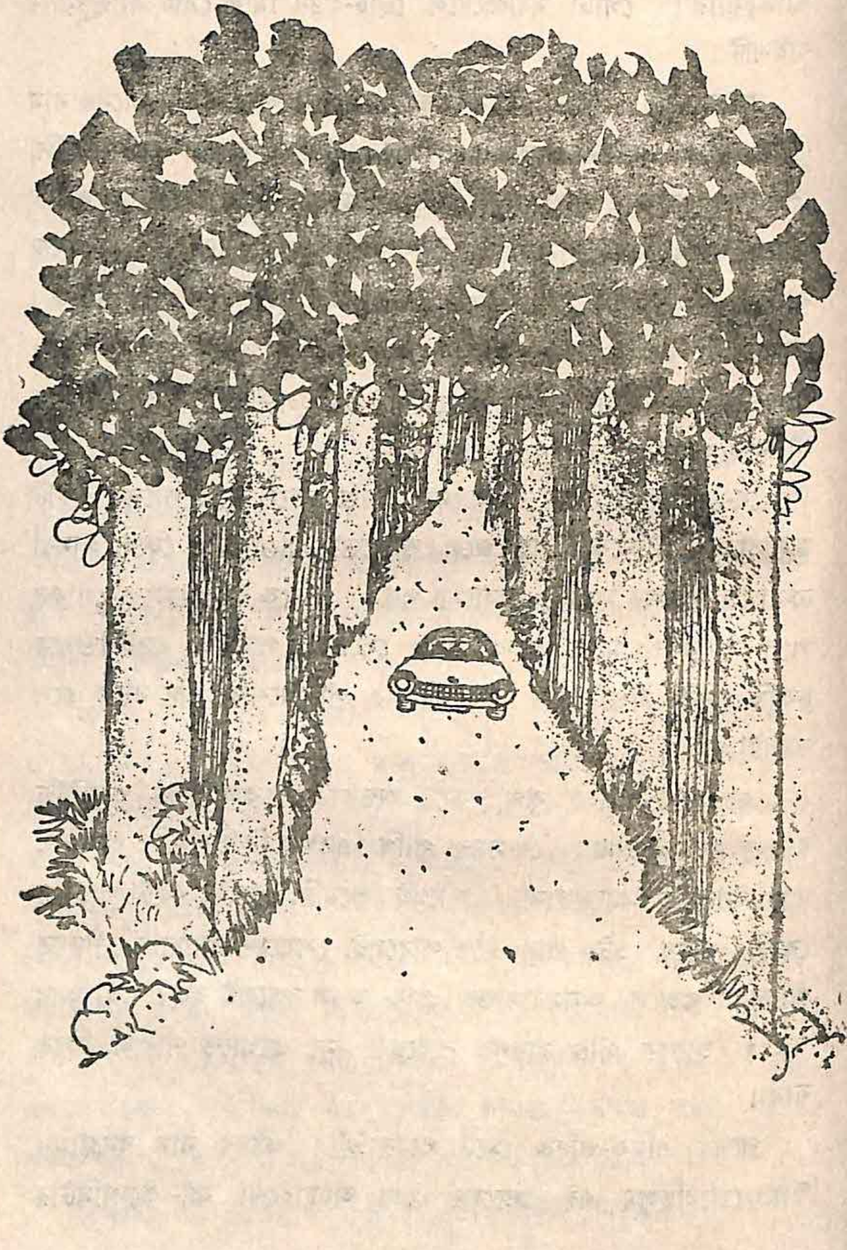
আহ্বানপুর স্থানীয় লোকের আদরের ডাকা নাম। ডাকনামও বলতে পারো। আসল, গালভরা নামটি হল 'বারনোয়াপাড়া ওয়াইলড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি।' গোটা মধ্যপ্রদেশে ছোট-বড়য় মিলে মোট স্যাঙ্কচুয়ারি বাইশটি।

আহ্বানপুর নামটি যেমন মজার, তেমনি আর-একটি ঘাসের নাম জেনে রাখো—দীননাথ ঘাস! সবাই চিনি। ঘাসের যে-বীজথলি, শেয়ালের লেজের মতো ঝুলে পড়েছে, জঙ্গলে গেলে আকছার দেখতে পাবে, তারই নাম দীননাথ। ইংরিজিতে 'ফক্স টেল'। এর বীজে যাবতীয় বনের পাখি বেঁচে থাকে। প্রায় কাঁকনিদানার মতো দেখতে। যে-কোনো জঙ্গলে গেলে হাজারে হাজারে আমলকী গাছ দেখবে। হরিণের প্রিয় খাবার। তেমনি দেখবে মাইল মাইল দীননাথ। আহ্বানপুরে দীননাথ আসা-যাওয়ার পথের দুপাশেই।

যে-চেকপোস্ট দিয়ে আমাদের গাড়ি ঢুকছে, তার পাশেই একটি জলাধার। বাঁদিকে, তার জলে সূর্যাস্তের রাঙা চেলি ফেলে আমরা ক্রমাগত জঙ্গলের মধ্যে। মরামের পথ। দুদিকে শিশুশাল। গোরুর পাল সেদিনকার মতো জঙ্গল সফর সেরে ঘর পানে। যতই ভিতরে ঢুকছি, ততই ঠাণ্ডা আর এক ধরনের পাঁচমিশেলি গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারছে।

এক সময় হঠাৎই ঝুপ্ করে অন্ধকার। কলাবাদুড় ওড়াউড়ি করছে মাথার উপর। যে-সমস্ত পাখি এতক্ষণ কিচিরমিচির করছিল, তারা আর রা কাড়ছে না। আগেই শুনেছি, পথেই একটা পাহাড়ি ঝোরা পড়বে, ওটা পার হতে পারলেই, শেষমেশ বাংলোয় পৌঁছুতে পারব। জঙ্গলে অ্যামবাসাডর প্রায় অচল বললেই হয়। কী আর করা? হাতের পাঁচ রায়পুর রয়েছে। না এগোতে পারলে, ফিরে যাব।

পথের এদিক-ওদিক মেটে ঘরের গাঁ। এদের নাম বনগ্রাম। পরে জেনেছিলুম এই জঙ্গলের প্রায় আড়াইশো বর্গ-কিলোমিটার



মধ্যে এরকম ছাব্বিশটি বনগ্রাম আছে। খেতিখামার আছে। বন হাসিল করে বসে গেছে এরা। কিছুতেই তোলা যাচ্ছে না। তোলার কারণটা এই, এদের ধান জোয়ারের খেতে হরিণ-শুয়োর পড়লে এরা মেরে ফেলতে রেয়াত করে না। তাছাড়া, হরিণ-তাড়ানি টিনের বাত্তি জন্তু-জানোয়ারদের কানে মোটেই মধুর ঠেকে না। তারা ভয় পেয়ে গভীর গভীরতর জঙ্গলের দিকে সরে যায়। আর তুমি-আমি ঘুরে ঘুরে হা-ক্লান্ত হয়ে, কিছু না দেখে ফিরে আসি।

জঙ্গলে হর্ন বাজাবার নিয়ম নেই। হেডলাইটের আলো জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সিংজি গাড়িটাকে ধীরেসুস্থে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দুপাশেই চাপ-ঠাস অন্ধকার। পথের উপর যদি কোনও প্রাণী দয়া করে আসে, তবেই চক্ষু সার্থক হবে। গাড়ির মধ্যে আমরাও দু-জোড়া চোখ জ্বালিয়ে প্রায় দমবন্ধ বসে আছি।

হঠাৎই কিছুদূরে পথের উপর ঝিকিয়ে উঠল দু-তিনজোড়া চোখ। সিংজি বলেছিল, হিংস্র মাংসাশীর চোখ করমচা-লাল। বাকি সব নীলচে। উত্তেজনায়, লাল-নীল কী দেখলুম এক্ষুনি, মনে রইল না। তবে, কিছু দেখলুম তো! সিংজি বলল, "চেতলের ঝাড়। স্পটলাইট থাকলে হরিণের পুরো পাল দেখিয়ে দিতুম।"

বাকি পথে দুটো বুনো খরগোশ ছুটে কিছুক্ষণ গাড়ির সামনে সামনে চলল। পরমুহূর্তে খেলাচ্ছলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘাসবনে। ব্যস, সে-রাতে ঐ পর্যন্ত! বাঘ-ভাল্লুকের দেখা মিলল না। আমার ধারণা, অনেকেই তাদের সঙ্গে দেখা করতে জঙ্গলে যায়। কিন্তু, দেখা পেলে কি আর তেমন ভাল লাগে? জঙ্গলে তাঁরা আছেন, এই খবরটাই যথেষ্ট।

বাংলোয় বিজলি নেই। মাথার উপর টানাপাখা। বড় বড় আরাম-কেদারা। বড় বড় চেয়ার-টেবিল। দুটো ঘর। মাঝখানে ডাইনিং। বসার ঘর নেই। বসলে কাঁথামুড়ি বারান্দায়। আকাশের এককোণে ট্যারা চাঁদ। জঙ্গল থেকে কোটরি হরিণ আর হনুমানের

ডাক ভেসে আসছে। টিনের বাত্তি তো আছেই।

চৌকিদারকে চালে-ডালে বসাতে বলে রেঞ্জারসায়েবের বাংলোর দিকে। সঙ্গে ডবল ডিমভাজা। এতেই হবে।

উকে সায়েব এসেছেন মাসখানেক হল। এ-জঙ্গলটাকে তেমনভাবে ছ্যাখেননি। ফরেস্টারকে ডেকে হুকুম দিলেন, খানাপিনার পর, একটু বেশি রাত করে যেন জঙ্গলটার বেশ খানিকটা আমাদের ঘুরিয়ে আনে। বললেন, ৮১-৮২ মে মাসের জানোয়ার-শুমারি অনুসারে বাঘ ছিল মোট পনেরো। দুটি মারা গেছে। গাঁয়ের লোকই পিটিয়ে মেরেছে। দোষ নেই, ওদের গোরুবাছুর আকছার খায়। বাইসন সাড়ে-তিন শ। ভালুক গোটা সত্তর। নীলগাই সাতষট্টি। হায়না বিশ। সবরকম হরিণ মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার। বিস্তর শুয়োর আর সোনকুত্তা। ময়াল সাপ পনেরো। ছোটবড় তালাও আছে বারো-তেরোটা। অর্থাৎ জঙ্গলে জলের অভাব নেই।

ফরেস্টার নিজে না এলে আর ডাকতে যাব না ঠিক করে লেপ টেনে আধশোয়া। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মাঘ মাসের অনেক দেরি। তবু, মনে হচ্ছে, বাঘের থাবার মতো মাঘের হিমানী! দরোজায় বারবার কয়েকবার টোকা। ভাবলুম, মট্‌কা মেরে থাকি। পরক্ষণে বিবেকের বিছে! খুলে দেখি, আপাদমস্তক কুমিরের চামড়ায় ঢেকে ফরেস্টার। সঙ্গে সিংজি। চলিয়ে।

রাতদুপুরের এই জঙ্গল ফুঁড়ে-ফুঁড়ে গোরু-খোঁজা করার মতো বাঘ-ভাল্লুক খোঁজার মধ্যে আমি কোনও বীরত্ব দেখি না। দেখাও যায়নি। দুটো শেয়াল এপাশ-ওপাশ করেছে। সেই বুনো খরগোশ কিছুটা পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যাণ্ড-ঝাঁপ মেরেছে। চল্লিশ মিনিট ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে রাস্তা খুঁড়ে খুঁড়ে আমাদের গাড়ি এদিক-ওদিক করে শেষ পর্যন্ত বাংলোর সামনে।

গঙ্গোই স্যাংকচুয়ারী আর হালকি সাউ

গঙ্গোই স্যাংকচুয়ারিতে ঢোকার মুখেই হালকি সাউ-এর চা মালাই, ক্ষীরমেঠাই-এর খাপড়ার চাল। দাবায় বসতে গেলে একটু ঝুঁকে ঢুকতে হয়। তাছাড়া, ছড়ানো-ছিটানো ছাঁচতলার রুজুরুজু অনেকগুলো বেঞ্চির মতন কাঠের পাটা। বেশ মোটা এবং শক্তসমর্থ। নীচে ইটবালির বাঁধানো দু-দুটো সাপোর্ট। একটিই দোকান। হ্যাঁ, সত্যি বলতে গেলে শীতের কাপকাটা ভোর তিনটে চারটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বরবর করছে। হ্যাজাকের আলোয় গোটা চত্বরটা মাঝরাত পর্যন্ত জেগে।

দিনে-রাতে যখনই সময় পেতুম হালকির দোকানে গিয়ে হাজির। কারণও আছে। আমরা যে-বাংলোটায় দু'দিনের অতিথি, সেখান থেকে দু' তিন কদম গেলেই হালকি। হালকি আর হালকিবৌঠান। আমরাই বলে-কয়ে ঐ নাম দিতে পেরেছিলুম। বাড়ির পিছনে বাগান। বাগানের মধ্যে গোয়ালে গুটি-চারেক গাই। পাঁঠি গুটি আটেক। হাঁস নেই, মুর্গি আছে। হিরেবাবুদের বাড়ি বাড়ি সেই ডিম আর ফোক্কা হয়ে যাওয়া মুর্গি বিক্রি হয়। কাছেই হীরকখাদান। হিরে তুলে তাদের হাতে টাকা থইথই।

হালকির বয়েস আন্দাজ করা অসম্ভব। তাই, একদিন একটু জানা-চেনা হবার পর, গপ্পের মেজাজে তার বয়েস জিজ্ঞেস করে সত্যিকারের অবাক হয়ে যাই। চার কুড়ি আট আর বৌঠান তিন কুড়ি সাত। হালকির চুল কিছু পেকেছে। দাঁত সামনের দু' তিনটি চুয়ার গর্তে। শক্ত পেটা চেহারা। ছিটেফোঁটা মেদ নেই। ঘোমটা

খুললে, তবেই বৌঠান। একটু বয়েসের রেখা, চুল নিপাট কালো। হাতে-পায়ে খাড়ু। উল্কির দাগ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভীষণ গপ্পে। কিন্তু কোনোদিকে চোখ কান কম নেই। যে যেরকম খদ্দের, তার প্রতি সেরকম কথা। কার কী চাই, কতটা চাই, কতটা চাপিয়ে দিলে কোনোপক্ষে অসুবিধা হবে না—সমস্ত নখদর্পণে।

হালকি সাউ-এর দোকান বহু পুরনো। ঠিক কত বছর, সে-ব্যাপারে না গিয়ে সে পুরনো দিনের টক-মিষ্টি-ঝাল জড়ানো গল্প অবিরাম বলে যেতে থাকে। দু' কুড়ি বয়েসে পাল্লা বাজারের কাছে সে ভাগে একটা দোকান দেয়। সেও ক্ষীরমেঠাই-এর দোকান। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অংশীদার হালকির সঙ্গে নানারকম ঝঞ্ঝাট লাগিয়ে দেয়। হালকি দোকান থেকে পালিয়ে সোজা গ্রামে। সেখানে গিয়ে হালগোরু বেচে, জমি-জমার অংশ বেহাত করে এই মাঝগাঁও-এ ফিরে আসে। কেননা, এক বছরে কিছু চেনাজানা হয়েছে তার। চেনা-পরিচিতরা ভালওবাসে। কয়েকখানা খাপড়ি তুলে গুমটিঘর বানিয়ে সে দোকান চালাতে থাকে।

এদিকে তখন লোকজন আর কই! মানুষের থেকে জন্তুজানোয়ার বেশি। সে-সব গপ্পো শুনলে আপনারা তাজ্জব হয়ে যাবেন। জানোয়ারের কী উপদ্রব। অগুনতি বাঘ, থিক থিক করছে চিতা। ভাল্লুকও বড় কম নয়। পাল্লা থেকে হাতির পিঠে হাওদা লাগিয়ে নবাব বাদশা আর তাদের শাগরেদ বন্ধুবান্ধব আসত শিকার খেলতে। ঐ যে কুঞ্জবন। নাম শোনেননি? কাল গিয়ে দেখে আসবেন একবার। সেই বিশাল প্রাসাদ আজ ভেঙেচুরে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। তবে, একনজরেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী ছিল একসময়। সামনে বিশাল দিঘি। শীতে হাঁসপাখির ঝাঁক এসে থেকে যেত মাসের পর মাস। শুনেছি, কোন্ না কোন্ বিদেশবিভুঁই থেকে উড়ে আসত এই পাল্লার দিঘি লাল করে মরতে। হাবাবোকা পাখির দল!

তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলত, জানেন? ঐ কুঞ্জবনের যেখানে সেখানে হিরের খণ্ড লুকিয়ে রাখা আছে। দিঘিতে



ঘড়া ঘড়া মোহর। দুঃসাহসী ছেলেছোকরারা যারাই লুকিয়ে চুরিয়ে ওগুলো হাতাতে গেছে—তাদের কেউ গেছে বাঘের পেটে। কাউকে পেটে পুরেছে ময়াল। পাল্লার রাজার অভিশপ্ত রত্নখনির সন্ধানে তো এ পর্যন্ত বহু লোকই এল গেল। এককণা উদ্ধার করতে পেরেছে? ছিটেফোঁটাও নয়।

এখন পাথর ফাটিয়ে, মেশিন বসিয়ে—লাখ-লাখ টাকা খরচ করে তবেই দু' দশটা টুকরো যোগাড় করতে পারছে। আর তাকেই মনে করছে সেই পাল্লারাজের লুকোনো ধনরত্নের কিছু মিলছে। ছোঃ।

হালকি নস্যাৎ করে দিল এক নিমেষে এই মাঝগাঁও হীরকখাদান থেকে হিরে খুঁটে পাবার গল্প!

এখানে এসে অবধি বেশ দু' চারজনের মুখেই এই লুকোনো ধনরত্নের কথা শুনেছি। এমনকি, পূর্ববাংলা থেকে বহু বাস্তুত্যাগীকে একদা মানা ক্যাম্প থেকে মধ্যপ্রদেশের বহু জায়গায় চারিয়ে দেওয়া হয়েছিল! তাঁরা কলোনি করে দু' পুরুষ কাটিয়ে দিতে চলেছেন আজ। সেই সব কলোনির বয়স্ক মানুষদের মুখেও এ-গল্পের কমতি নেই। সকলেরই বিশ্বাস, সবটাই গালগপ্পো নয়। এর মধ্যে কিছুকিঞ্চিৎ সত্যি আছেই। কলোনির ছেলেদের মধ্যেও কেউ কেউ সেই অভিশপ্ত গুপ্তধনের খোঁজ-তালাশে কখনো-সখনো গিয়ে আর ফিরে আসেনি। বলেকয়ে তো আর কেউ রত্নসন্ধানে যায় না। গোপনে গিয়েছিল, গোপনেই রয়ে গেছে। তাদের কেউ আর কোনও খোঁজখবর পায়নি কখনও।

আমরা যে দু' দিন দু' রাত্তির গঙ্গোই স্যাংকচুয়ারির বনবাংলোয় ছিলুম—আমাদের বহু সময় এই গুপ্তধনের গপ্পো শুনতে কেটে গেছে। মধ্যপ্রদেশের এ-জঙ্গল ও-জঙ্গল ঠেঙিয়ে শেষমেশ কোথায় এসে পড়লুম? বুড়ো বয়সে এক রূপকথার দেশে! এখানকার বাতাসে শুধুই হিরে মুক্তো চুনি পান্না উড়ে-বেড়ানোর গপ্পো! নবাববাদশার শিকার খেলার গপ্পো। রাজারাজড়ার হারজিত, লোভহিংসা, উদারতার গপ্পো। মাণ্ডুর রাজবাহাদুর-রূপমতীর কাহিনী। কিন্তু, সব গপ্পোকে ছাড়িয়ে গেছে,

আমাদের এই হালকি সাউ। চেহারা দেখলে তোমরা ঠিক চিনতে পারবে তাকে। এক্কেবারে 'রাজকাহিনী'র পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্র।

বাংলোর পিছনকার গঙ্গোই স্যাংকচুয়ারি—এই মাস দুয়েক হল জাতীয় পার্কের মর্যাদা পেয়েছে। এখনো সেই মর্যাদার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায়নি। একটা ছোটখাটো বাংলোই মাত্র হয়েছে স্যাংকচুয়ারির মুখে। বহু ব্যবস্থাই বাকি। প্রকৃতপক্ষে, সব ব্যবস্থাই বাকি।

আমরা গাড়ি নিয়ে সোজা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। জঙ্গল ঠিক দৃশ্য হল না। মাঝেমধ্যেই শাল আর মহুয়া একা একা—প্রায় ন্যাড়া মাথায় চুটকির মতন জেগে আছে। আমরা দু' পাশে মাইল মাইল 'সেরিংগেটি' ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে অবাধে চলেছি। ড্রাইভারকে নির্দেশ দেওয়াই আছে আস্তে-ধীরে চালানোর জন্য। আমরা দু' পাশে চোখ রেখে যাচ্ছি। এখানে অন্য কোনও বড়-র আশা বৃথা। হরিণ পাওয়া যাবে। হরিণ এই ঘাসভূমি খুব ভালবাসে। একটা-আধটা বুনো খরগোশ এদিক-ওদিক লাফিয়ে ঘাসে ডুব দিল। বেশ দূরে পালে পালে হরিণ। সবই আছে। চৌশিঙ্গা, চিতল, কৃষ্ণসার। আর সামনেই পোষা খাটো ধরনের ঘোড়ার পাল। রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। এর মধ্যে জন্তুজানোয়ার মেলা ভার। ইতিমধ্যে কিলো চার-পাঁচ ঢুকে পড়েছি। রোদ্দুরে ঘাম দিচ্ছে। জলতেষ্টাও পেয়েছে। একবাক্যে সবাই রাজি বাংলোয় ফিরতে। ফিরে এলুম। সন্ধের আগে এক ফরেস্ট গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার পরিকল্পনা আছেই আগে থেকে। সার্চলাইট জরুরি। তারও ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘরে ফেরার আগে চায়ের জন্য হালকির দরবারে। যতই দেখি, লোকটির প্রতি বিস্ময়ে বিমূঢ় হই। ওর দুই ছেলেই খুব বড় সরকারি চাকরে। রেওয়ায় বড়র বিশাল বাংলো। আর্দালি দরোয়ান গাড়ি ঘোড়া কী নেই। মেজো উমারিয়ার ওয়েস্টার্ন কোলফিল্ডে। সেও মেজোর মতন বড় মাপের। ছোট জব্বলপুরে পড়ায়।

হালকি হাসতে হাসতে বলে, আর আমরা দুই বুড়োবুড়ি, সেইসব ধনরত্ন ফেলে এখানে পড়ে আছি। ওরা খুব রাগারাগি করে। আমি তবু নাগরা পায়ে দিই। বুড়ি তো খালি পা। বাবা, ভুলে যাইনি— এই দোকান চালিয়ে ওদের মানুষ করেছি। যতদিন বাঁচব, আপনাদের সেবা করে যাব। এ দোকান আমার লছমিমাঈ। লছমি ছোড়লে উয়াদেরই খারাব হোবে।
